মেঘ বৃষ্টি আলো

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রকাশ : আষাঢ়, ১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীভুবনমোহন মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর :
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯এ, মনমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ব্রততী ও পার্থ মুখোপাধ্যায়কে

॥ ১ ॥

দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র

বিকেল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু এখনো ভালো করে সন্ধ্যে নামে নি। আকাশে এক রকমের মন্থর আলো। এই খানিকটা সময় চেনা শহরের সব দৃশ্যই একটু বদলে যায়, সব কিছুতে একটু রহস্যের স্পর্শ লাগে, এই সময়ে মানুষের মুখ দেখলে তার ভেতরটা ঠিক চেনা যায় না।

গড়িয়াহাটের মোড়ে এখন বেশ ভিড়। শাড়ীর দোকানে, ফুলের দোকানে, সন্দেশের দোকানে, লটারির টিকিটের দোকানে জমজমাট ভিড়। অনেকগুলো মোটর গাড়ি থেমে আছে রাস্তার দু'পাশে, অনেক লোক অপেক্ষা করছে ট্রাম বাসের জন্য—সহজে উঠতে পারবে না জেনেও। কেউ কেউ হেঁটে যাচ্ছে ব্যস্ত ভাবে, ট্যাক্সিগুলো উসখুস করছে ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে, আবার কোথাও কোথাও একটি করে ছোটুখাটো দল দাঁড়িয়ে জটলা করছে, তাদের কোনো ব্যস্ততা নেই। এখন এখানে যত নারী তাদের কারুরই শাড়ীর ডিজাইন এক রকম নয়, রামধনুর সাত রং টুকরো টুকরো করে ছড়ানো। যে-সব যুবকেরা এদিকে দাঁড়ানো তাদের প্যান্টের ইস্ত্রি নিখুঁত, শার্টের কলার খাড়া, যদিও অনেকেই বেকার। প্রৌঢ়দের ধুতি-পাঞ্জাবি শুভ্র নিপাট, কোথাও কোনো জটিলতা নেই—শুধু কমা সেমিকোলনের মতন এখানে ওখানে কিছু ভিখিরি ছড়ানো। আর থামে হেলান দেওয়া শতচ্ছিন্ন পোশাকে একটি পাগল।

এই ভিড়ের মধ্যে থেকে আমরা তিনজনকে আলাদা করে বেছে নিলাম। তিনটি নারী। এইমাত্র ওঁরা একটি ভ্যারাইটি স্টোর্স থেকে বেরুলেন। একজন বর্ষীয়সী, চওড়া পাড়ের শান্তিপুরী শাড়ী পরে আছেন, বয়েস চল্লিশের এপারে না ওপারে ঠিক বোঝা যায় না, শরীরের বাঁধুনি আছে এখনো, ঈষৎ ভারীর

দিকে, তবে সংসারের কর্ত্রী হতে গেলে ঠিক যতটা মানায়। এঁর হাতে একটি বড় ব্রাউন প্যাকেট। ডান পাশের মেয়েটির গাঢ় নীল রঙের সিল্কের শাড়ী, ব্লাউজের রংও তাই, এত নীলের জন্য তার ফর্সা রং আরও বেশী ফর্সা দেখাচ্ছে। মেয়েটির মুখটা কিন্তু একটু ম্লান, চোখের দৃষ্টি চঞ্চল। বাঁ পাশের মেয়েটির এলোমেলো জংলা ডিজাইনের ছাপা শাড়ী—বেশ চোখ টেনে নেয়, গায়ের রং একটু চাপা, কিন্তু শরীরের গড়নটি সুন্দর, যে কোন কারণেই হোক, তার চোখের দিকে এক পলক তাকালে আবার তাকাতে ইচ্ছে করে।

বর্ষীয়সী নারীটি মুখে ঝলমলে হাসি ফুটিয়ে বললেন, কাট গ্লাসের সেটটা ভারী সুন্দর ছিল, না রে মিঠু ?

গাঢ় নীল রঙের শাড়ী পরা মেয়েটি বললো, নিউ মার্কেটে আরও ভালো পাওয়া যায়।

বর্ষীয়সী সে কথায় মনোযোগ না দিয়ে বললেন, খুব কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এত দাম! কিছুতেই কমালো না।

—মা, ওগুলো কিন্তু ইমিটেশান। আসল নয়।

—হ্যাঁ, আসল নয়, তোকে বলেছে! এত দামের জিনিস! কি অনুরাধা, ওগুলো আসল নয় ?

ছাপা শাড়ী পরা মেয়েটি হেসে বললো, কি জানি, মাসীমা, আমি ঠিক চিনি না! তবে আসল কাট গ্লাসের সেট কি এখন আর নতুন পাওয়া যায় ?

—বাঃ, ওরা যে এত করে বললো!

কথা বলতে বলতে ওরা এসে পৌঁছুলেন একটা নীল রঙের গাড়ীর সামনে। উর্দি পরা ড্রাইভার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিল। দুই তরুণী পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করলো, কি যেন একটা কথা হয়ে গেল এক নিমেষে।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, মাসীমা, জয়শ্রী একটু আমার সঙ্গে যাবে ?

—কোথায় ?

—এই, একটু আমাদের বাড়িতে।

—তোমাদের বাড়িতে ? তুমি যে বললে, তুমি এখন রামকৃষ্ণ মিশনে বই আনতে যাবে ?

—হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে বেশীক্ষণ থাকবো না। বই নিয়েই আমাদের বাড়িতে যাবো।

—মিঠু তো কালকেই তোমাদের বাড়িতে গিয়েছিল। আজ আবার যাবে কি করতে!

জয়শ্রী বললো, কাল না পরশু!

ওর মা হেসে বললেন, ও পরশু! পরশু গিয়েছিলি, আজই আবার যেতে হবে! এই তো দেখা হলো!

—যাই একটু, আটটার মধ্যে ফিরে আসবো।

—কি করে ফিরবি? গাড়ি তো ছেড়ে দিতে হবে, গাড়ি পাঠানো যাবে না।

—বাঃ, আমি বুঝি ট্রামে বাসে ফিরতে পারি না? ট্রামে-বাসে কখনো আসি না নাকি?

অনুরাধা বললো, মাসীমা, আমি ওকে বাসে তুলে দেবো!

জয়শ্রীর মা অলকা একটুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলেন। প্রায় রাজী হতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, এই এই, দেখিস দেখিস, অনুরাধা এদিকে সরে এসো!

দুই তরুণীর শরীর আচমকা কেঁপে উঠলো, পেছনে না তাকিয়েই দ্রুত সরে এলো গাড়ির দিকে।

ফুটপাথের ফুলের দোকানের এক গোছা রজনীগন্ধায় মুখ দিয়েছে একটা ষাঁড়। দোকানদার হাঁ হাঁ করে উঠেছে, তাড়া খেয়ে ষাঁড়টা দৌড়ে আসছে এদিকেই, মুখে তখনো রজনীগন্ধার ডাঁটা।

ওঁরা তিনজন হুড়োহুড়ি করে ঢুকে পড়লেন গাড়ির মধ্যে। ষাঁড়টা ততক্ষণে ট্রাম লাইনে, রাস্তায় বেশ একটা হৈ হৈ, গাড়ির মধ্যে তিন রমণী হেসে খুন।

গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে, কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় কেন যেন মন বদলে গেল জয়শ্রীর মায়ের। হাসি থামার পর জয়শ্রী বললো, মা, তুমি তাহলে আমাদের অনুরাধাদের বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যেও।

অলকা মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন, না থাক, আজ আর যেতে হবে না। অনুরাধা, ও আজ যাবে না, আর একদিন যাবে, কেমন?

অলকার গলার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, শুনলেই বোঝা যায়, তাঁর এই কথাটাই চূড়ান্ত, আর কোনো অনুরোধ তিনি শুনতে চান না।

জয়শ্রী আর অনুরাধা পরস্পরের দিকে তাকালো। জয়শ্রীর চোখ ক্রোধ-চঞ্চলা, সে আর একটাও কথা বললো না। অনুরাধা নিচু স্বরে বললো, মাসীমা, আমি তবে নেমে পড়ি, আমি তো আর ওদিকে যাবো না।

—চলো, তোমাকে রামকৃষ্ণ মিশনে পৌঁছে দিচ্ছি।

বাকি রাস্তাটা আর কোনো কথা হলো না। গোল পার্কে রামকৃষ্ণ

মিশনের কাছে নেমে গেল অনুরাধা, জয়শ্রী তখনো কিছু বললো না আর। অলকা বললেন, আর একদিন এসো—

মন্থর পায়ে রামকৃষ্ণ মিশনের বাড়িতে ঢুকে গেল অনুরাধা, বেরিয়ে এলো মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই, হাতে দুটি বই। অনুরাধা এখান থেকেই বাসে উঠতে পারে, উঠলো না, হাঁটতে লাগলো আস্তে আস্তে, আবার গড়িয়াহাটের দিকে।

হাঁটার সময় অনুরাধা এদিক ওদিক তাকায় না, প্রায় মাটির দিকেই চেয়ে থাকে। কেন না, অন্যদিকে তাকালেই তার চোখে পড়বে, চলন্ত ট্যাক্সি থেকে, পানের দোকান, চায়ের দোকান থেকে, গাড়িবারান্দা থেকে, রাস্তার ওপার থেকে—শত শত চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। একসঙ্গে এত দৃষ্টি তার সহ্য হয় না। তার গায়ে ফোটে। অবশ্য, অনুরাধা এমন কিছু আহামরি সুন্দরী নয়। কিংবা তার পোশাকে এমন কিছু লোলুপ করার ব্যবস্থা নেই যে রাস্তার সব লোক তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে—সে এমনিই মোটামুটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী তরুণী—কিন্তু সেটাই পুরুষপ্রধান কলকাতা শহরে লোভী দৃষ্টি টানবার পক্ষে যথেষ্ট।

অনুরাধা যতদূর সম্ভব সম্ভ্রম রেখে, লোকজনের স্পর্শ বাঁচিয়ে, হাঁটছে আস্তে আস্তে। সব অবশ্য ঠিক থাকছে না, কেউ কেউ পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করে গা ছুঁয়ে যায়, কানে আসে দু' একটা অশালীন মন্তব্য, কিন্তু এ সবই মেয়েদের গা-সহা। অনুরাধা অন্য কিছু একটা ভাবছে।

ও-পাশের ফুটপাথ থেকে কোণাকুণি রাস্তা পার হয়ে একটি ছেলে এগিয়ে এলো অনুরাধার দিকে। ছেলেটি পরে আছে ধুতি আর পাঞ্জাবি, বেশ সরল উন্নত চেহারা, কপালটা যথেষ্ট চওড়া। অনুরাধা মুখ তোলে নি, ছেলেটিকে দেখতে পায় নি। ছেলেটি এখন অনুরাধার পাশে পাশে হাঁটছে।

ছেলেটি বললো, অনুরাধা, তুমি এদিকে?

মুখ না তুলেই অনুরাধা বললো, রামকৃষ্ণ মিশনে এসেছিলাম।

—ও, এখানে আসো বুঝি প্রায়ই?

—সপ্তাহে দু'দিন।

—আমি রাস্তার ওপাশ থেকে হঠাৎ তোমাকে দেখতে পেয়ে চলে এলাম।

অনুরাধা এবার ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললো, তাই বুঝি?

—আমি যাচ্ছিলাম এক বন্ধুর বাড়িতে—

—কোনদিকে আপনার বন্ধুর বাড়ি?

—তুমি যে-দিকে যাচ্ছো সেই দিকেই।

—আমি যদি এখন চেতলায় যাই?

—চেতলাতেও আমার এক বন্ধু থাকে। তার সঙ্গেও অনেকদিন দেখা করা হয়নি।

—চলুন তাহলে—

—কোথায় ?

—চেতলায় !

—নিশ্চয়ই। চলো, যাওয়া যাক। কিন্তু এক্ষুণি যেতে হবে ? একটু দেরী করে গেলে হয় না ?

যখন একা, তখন সারা পৃথিবীর অস্তিত্ব বড় বেশী টের পাওয়া যায়। দু'জন হলেই তৈরী হয় একটা আলাদা জগৎ। অনুরাধা এখন মাটির দিকে চেয়ে নেই, কিন্তু এখন আর পথ চলতি মানুষের দৃষ্টিবাণ তার চোখে পড়ছে না, কানে আসছে না অন্য কারুব পানসে রসালাপ।

অনুরাধা বই দুটো ছেলেটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ধরুন। তারপর সে তার শাড়ীর আঁচল ঠিক করে নিল, কানের কাছে হাত নিয়ে এক গোছা অবাধ্য চুল ঠেলে দিল কানের পেছনে। হালকা কৌতুকমাখা মুখ সোজাসুজি ছেলেটির দিকে তুলে বললো, তা হলে বোঝা গেল, বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার খুব একটা তাড়া নেই। এরপর যদি শোনা যায়, এ পাড়ায় কিংবা চেতলায় শান্তনু সরকারের একজনও বন্ধু নেই, তা হলেও বোধহয় মহাভারত অশুদ্ধ হবে না।

—এ পাড়ায় একজনও বন্ধু নেই, তা হতে পারে না। দু' একজন বন্ধু নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করাটা এখন জরুরী কিনা, সেটা একটা প্রশ্ন হতে পারে।

—কিংবা এমনও হতে পারে, অন্য কোথাও আপনার কোনো বন্ধু সত্যিই আপনাকে কোনো জরুরী কাজে খুঁজছে, আর আপনি তার হাত এড়িয়ে এখানে একা একা—

—সন্ধ্যেবেলা কি কেউ কোনো জরুরী কাজ করে ?

বই দুটো ফেরৎ নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অনুরাধা বললো, আমি চা খাবো। এবং এই কথায় শান্তনু যে হঠাৎ কেন বিচলিত হয়ে উঠলো, তাই বা কে জানে। ইতস্তত করতে করতে বললো, চা এখানে তো ঠিক চায়ের ···তুমি কোকাকোলা খাবে ?

—না, আমার চা-তেষ্টা পেয়েছে।

—কিন্তু এ পাড়ায় তো ঠিক ভালো চায়ের দোকান সে রকম···মাদ্রাজীদের একটা দোকান আছে, সেখানে কফি খাওয়া যায়—

—না, আমি চা-ই খাবো! এ পাড়ায় না পাওয়া যায়, অন্য পাড়ায় গিয়ে খাবো।

—কোথায়?

—এসপ্লানেডে। কিংবা গঙ্গার ধারে।

শান্তনু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছলো, ঘড়ি দেখলো। অনুরাধা নিঃশব্দে সারা মুখ জুড়ে হাসছে। মেয়েরা এরকম হাসতে পারে। শান্তনুর চোখে চোখ পড়তেই অনুরাধা বললো, জয়শ্রী আজ আর আসবে না।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা কঠিন হয়ে গেল শান্তনুর। আবার ঘড়ি দেখে শুকনো গলায় বললো, আসবে না?

—না।

—তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

—কখন?

—এই ধরুন, পৌনে চারটের সময়। ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—তারপর? ও বাড়ি থেকে বেরুলো না? শরীর টরির খারাপ?

—শরীর ভালো আছে, মন খারাপ।

—বাড়ি থেকে বেরুলো না সেইজন্য? বাড়িতে বসে থাকলে তো আরও বেশী মন খারাপ হবে।

—আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল। মাসীমাও সঙ্গে এলেন।

—তারপর উনি বুঝি কচি খুকীর মতন মেয়েকে আগলে আগলে রাখলেন?

—বলাই বাহুল্য।

—এবং জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

—না, তা ঠিক নয়। গড়িয়াহাটা থেকে উনি জয়শ্রীকে আমার সঙ্গে ছেড়ে দিতে প্রায় রাজী হয়ে গিয়েছিলেন—আমাদের বাড়িতে থাকবে রাত আটটা পর্যন্ত—হঠাৎ মত বদলে গেল।

—কেন?

—অশুভ চিহ্ন দেখা দিল যে। ষাঁড় তাড়া করলো—বলতে বলতেই ঝরঝর করে হেসে উঠলো অনুরাধা। শান্তনুও হাসি চাপতে পারলো না। গড়িয়াহাটার মোড়ে উচ্চস্বরে হাসছে ওরা দুজন।

এখানে বলে দেওয়া যায় যে, জয়শ্রী সম্পর্কে এতখানি বিবরণ শান্তনুর কাছে প্রায় অবান্তর। কেন না, এ সবই তার জানা। অলকা দেবীর সঙ্গে জয়শ্রী

আর অনুরাধা যখন দোকানে ঢুকেছিল, তখন রাস্তার বিপরীত দিকে গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছিল শান্তনু। সে সবই দেখেছে, এমন কি, ফুলের দোকানে যণ্ডের উৎপাত পর্যন্ত। শান্তনু সেটা অনুরাধাকে জানাতে চায় না অবশ্য। বুদ্ধিমান পুরুষ কোনো নারীর জন্য প্রতীক্ষার কথা অপর নারীকে জানাতে চায় না।

এদিকে, অনুরাধাও জানে যে শান্তনুর এ সবই জানা। ওরা দু'জনেই দেখতে পেয়েছিল শান্তনুকে,জয়শ্রী চোখের ইশারায় অনুরাধাকে অনুরোধ করে গেছে শান্তনুকে খবর দিয়ে যেতে। তবু অনুরাধা ঐ কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে রঙ্গ করছিল। যৌবনের ধর্মই এই, অতি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার নিয়েও রঙ্গ করতে পারে।

সিগারেট ধরিয়ে শান্তনু বললো, এরকমভাবে আর কতদিন চলবে ?

ভ্রূভঙ্গি করে অনুরাধা বলল, একদিনও চলা উচিত নয়।

—তা হলে ?

—তা হলে !

—আচ্ছা অনুরাধা, তুমি তো তোমার বন্ধুকে ভালো করে চেনো—

—কেন, আপনি ভালো করে চেনেন না ?

—সেটা আলাদা। মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্বটা অন্যরকম। বিয়ের আগে একটি মেয়ে তার একজন মেয়ে বন্ধুকে যে-সব গোপন কথা বলে—তার প্রেমিককেও সে সব কথা বলতে পারে না।

—আপনি মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে এক্সপার্ট হয়ে উঠলেন যে !

—তা হবো না ? প্রত্যেক বছর অন্তত শ' চারেক মেয়েকে দেখেছি—

—শুধু দেখলেই হয় না—

—আচ্ছা, ও কথা থাক। যা বলছিলাম, তোমার কি মনে হয়, জয়শ্রীর মনে একটুও দ্বিধা আছে ?

—কি ব্যাপারে ?

—আমি যা করতে বলবো, জয়শ্রী ঠিক তাই করবে ?

—সেটা আপনি আর জয়শ্রীই তো ভালো বুঝবেন।

—মাঝে মাঝে কি রকম ভয় হয়। জয়শ্রী মুখে যা বলে,—মনের মধ্যেও সত্যিকারের সেই জোর আছে কিনা না জানলে···পরে অনুতাপ করতে হবে, এমন কোনো ব্যাপার আমি চাই না।

—মানুষ নিজের ইচ্ছেয় একটা কাজ করলেও কি পরে অনুতাপ করে না ? আমার দাদার কথাই ধরুন না। আমার দাদা কলকাতায় চাকরি ছেড়ে

বোম্বেতে একটা চাকরি নিয়ে চলে গেল। সব্বাই কত বারণ করেছিল, দাদা কারুর কথা শুনলো না; ওখানকার চাকরিতে নাকি প্রসপেক্ট বেশী। অথচ দাদার এখন বোম্বেতে একদম মন টি'কছে না। নিজেই জোর করে গিয়েছিল, এখন অনুতাপ করছে।

—তা হলেও, এ জন্য তো অন্য কারুকে দোষ দেওয়া যায় না। নিজের ইচ্ছেমতন একটা কিছু করতে গিয়ে যদি ভুলও হয়, তবু প্রত্যেক সাবালক মানুষের সেটাই করা উচিত। জীবনটা তো তার নিজের।

—তা হলে শুনুন, জয়শ্রী সম্পর্কে একটা কথা বলছি। জয়শ্রী আপনাকে ছাড়া আব অন্য কোনো কিছু ভাবতে পাবে না। আপনার জন্য ও পৃথিবীর আর সব কিছু ছেড়ে দিতে রাজী আছে।

—তুমি সত্যি জানো?

—কাচকে কাচ, লোহাকে লোহা বলে যে-রকম জানি, এটাও সে-রকম—

—তবু, মাঝে মাঝে আমার খটকা লাগে কেন?

—তার আগে বলুন, আপনি জয়শ্রীর জন্য সব কিছু ছাড়তে রাজী আছেন?

—মেয়েদের মতন ছেলেদের তো সব কিছু ছাড়ার দবকার হয় না। আমাব ক্ষেত্রে সে-রকম কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

—এই কথাটাই তো আপনাদের সব সময় মনে থাকে না। ওর বাবা মা যদি শেষ পর্যন্ত বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তা হলে হয়তো জয়শ্রী বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে। কিন্তু সেটা যদি এড়ানো যায়, যদি বাবা মা-কে শেষ পর্যন্ত রাজী করানো যায়—তবে সেটাই কি ভালো নয়?

—আমি তো সেইজন্যই এতদিন অপেক্ষা করছি।

—একটা কথা ভেবে দেখুন তো, আপনাকে জয়শ্রী কতদিন চেনে? তিন বছর, সাড়ে তিন বছর—আব ওর বাবা মাকে চেনে তেইশ বছর ধরে—এক কথায় তাঁদের ছেড়ে আসবে আপনার জন্য—মেয়েরা অবশ্য তা-ও পারে, তবু—

শান্তনু হেসে বললো, অনুরাধা, এত সব ভালো ভালো যুক্তিপূর্ণ কথা তোমার মাথায় আসে কি করে?

অনুরাধা লজ্জা পেয়ে গেল। অন্যদিকে চোখ সরিয়ে বললো, অন্যের ব্যাপারে যুক্তিটুক্তির কথা সবাই বলতে পারে।

—তোমার নিজের ব্যাপারটা কি বলো তো! এতদিন ধরে তোমাকে দেখছি, অথচ তোমার কোনো দুর্বল ব্যাপার টের পাচ্ছি না।

—আমার কোনো দুর্বল ব্যাপার নেই।

—হৃদয়ঘটিত কোনো দুর্বলতা কখনো ঘটেনি বলতে চাও?

—না।

—হতেই পারে না, আই ডোণ্ট বিলিভ।

—আচ্ছা মশাই, আমার কথা এখন থাক তো। যা কথা হচ্ছিল তাই হোক! জয়শ্রীর সঙ্গে দেখা হলো না, আজ সন্ধেবেলাটাই মাটি হয়ে গেল তো?

সিগারেটের টুকরোটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে শান্তনু বললো, ওঁরা যদি জয়শ্রীকে আটকে রাখার কথা ভাবেন তা হলে খুব ভুল করবেন। আমি দরকার হলে ওকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো। সেজন্য যা কিছু করতে হয় করবো। কিন্তু তার আগে জয়শ্রী যাতে চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে নেয়।

—জয়শ্রীর মন ঠিক আছে—

—মুশকিল যে ওর সঙ্গে দেখাই করতে পারছি না! টেলিফোন কবতেও বারণ করেছে! একদিন টেলিফোন করে কি ঝঞ্ঝাট।

—কি হয়েছিল? কে ধরেছিল?

—তা ঠিক জানি না। কিন্তু ভয়ানক গম্ভীর আর কর্কশ গলা। প্রথমেই আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি মিথ্যে টিথ্যে বলি না—নিজের নামই বলে দিলুম। তারপর তিনি বললেন, জয়শ্রী এখন চারতলায় আছে, ডাকার অসুবিধে আছে—কি দরকার যেন তাঁকে বলি! কি রকম ব্যাড ম্যানার্স ভেবে ছাখো।

—এই, কে ফোন ধরেছিল, সেটা না জেনেশুনে—

—যেই ধরুক। আচ্ছা, কে ওরকমভাবে কথা বলতে পারে ওদের বাড়িতে? তুমি তো সবাইকে চেনো—

—আমি জানি না। তবে জয়শ্রীর বাবা নয় নিশ্চয়ই।

—আমার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—উঁহু, মেজাজ গরম করা ঠিক নয়!

—আমি নিজেকে চেক করলাম অতিকষ্টে। জয়শ্রীর সঙ্গে তো আমার বিয়ে হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না—শুধু শুধু ওদের বাড়ির কারুর সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই না—যদি না ওঁরা বেশী বাড়াবাড়ি করেন।

—বুঝেছি! টেলিফোনও করা যাচ্ছে না, দেখাও হচ্ছে না। তাহলে কি-হবে? চিঠি?

—এখন তুমিই ভরসা।

—পিওনের কাজ আমার দ্বারা হবে না।

—তোমাকে সে রকম রিকোয়েস্ট করতে আমার সাহসও হয় না। তুমি যদি-নিজের থেকে কিছু একটা···তুমি জয়শ্রীর প্রাণের বন্ধু—

—আমার বুঝি খেয়ে-দেয়ে আর কিছু কাজকর্ম নেই? শুধু আপনাদের ব্যাপার নিয়েই দিনের পর দিন—

শান্তনু চুপ করে গেল। তার মুখখানা এখন কাঁচুমাচু। পুরোটা সত্যি সত্যি নয় অবশ্য, খানিকটা অভিনয়, এ রকম করতে হয়। আংশিকভাবে সে অনুরাধার কাছে দয়া চাইছে, আংশিকভাবে সে অনুরাধাকে দয়া দেখাবার সুযোগ দিচ্ছে। অনুরাধা চোখে হাসি রেখে, ঠোঁট সরু করে বললো, আহা বেচারা! কি হবে এখন!

শান্তনু তখনও চুপ।

অনুরাধা বললো, কাল সন্ধ্যে ছ'টার সময় আমি জয়শ্রীকে নিয়ে আসবো। ওর সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

—কোথায়?

—আপনি বলুন? বেশ একটা রোমান্টিক জায়গায়, বকুল গাছটাছের নিচে।

—আমার তো মনে হচ্ছে, অনুরাধা, তোমার এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতা আছে, তুমিই একটা জায়গা বলো না।

—এই, কে বলেছে, আমার অভিজ্ঞতা আছে?

—নেই?

—থাকলেই বা। এ সব ব্যাপারে একজনের অভিজ্ঞতা অন্যের কাজে লাগে না।

—তাহলে ভিক্টোরিয়ায় আসবে?

—ধ্যাৎ, ওখানে রাজ্যের চেনা লোক। ওখানে কেউ যায় নাকি আজকাল। আপনি লাইট হাউস সিনেমার সামনে আসুন।

শান্তনু মুখে একটা কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ ভাব ফুটিয়ে বললো, ব্যাপারটা হয়ে যাক্। তারপর বৃন্দেদূতীকে একটা দারুণ কিছু উপহার দেবো।

অনুরাধা কিন্তু রেগে গেল। বললো, আপনি কিছু জানেন না! বৃন্দেদূতী তো থাকে অবৈধ প্রেমের ব্যাপারে। আপনাদের তো সে রকম কিছু না—

লজ্জা পেয়ে শান্তনু বললো, তাই বুঝি? তা হলে তোমাকে কি বলা যায়?

—কিছু না। আমি চলি এবার—

—দাঁড়াও।

শান্তনু হঠাৎ খুব সপ্রতিভভাবে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে ডেকে ফেললো, অনুরাধাকে বললো, এসো—।

অনুরাধা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, কোথায়?

—এসপ্লানেডে কিংবা গঙ্গার ধারে। তুমি যে চা খাবে বললে?

—এতক্ষণে মনে পড়লো ? আমি চা খেতে চেয়েছিলাম সেই আধ ঘণ্টা আগে—এতক্ষণ নিজের কথায় মত্ত হয়ে ছিলেন, মনেই পড়ে নি। এখন যেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে—আমার আর চা-তেষ্টা নেই।

—অনুরাধা, প্লীজ, চলো—

—না।

—তাহলে আমি রাগ করবো কিন্তু—

—আপনি রাগ করলে আমার বয়েই গেল।

—এসো, দেরী করো না, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা চা যদি খেতে না চাও, চলো, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিচ্ছি।

অনুরাধা সহাস্যমুখে অদ্ভুত ভ্রূভঙ্গি করে বললো, না, আমি বাসে যাবো।

—এই কি হচ্ছে কি ! এসো—

অনুরাধা আর উত্তর দিল না, শান্তনুর দিকে আর একবার দুষ্টু চোখে তাকিয়ে হেঁটে গেল বাস-স্টপের দিকে। শান্তনু ট্যাক্সিটায় উঠবে না ছেড়ে দেবে ঠিক করতে পারলো না, বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে শেষ পর্যন্ত মিটিয়ে দিল মিটার ডাউনের পয়সা। তারপর বাস স্টপের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে দেখলো ততক্ষণে অনুরাধা একটা নীল দোতলা বাসে উঠে পড়ে শান্তনুর দিকে ঝিরিঝিরি করে আঙুল নাড়ছে ঠাট্টাচ্ছলে।

॥ ১ ॥

ও কার ঘরণী, ও কার বালা ?

মধ্য রাত। ঘরে একটা হালকা নীল আলো জ্বলছে। মশারির মধ্যে অলকা আর হৃষীকেশ নিদ্রাপ্লুত। তবে হৃষীকেশের চোখের পাতা কাঁপছে মাঝে মাঝে অর্থাৎ ঘুম গাঢ় নয়। বালিশে এক রাশ চুল মেলে দিয়ে অলকার ঘুম গভীর।

হৃষীকেশ ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরে শুয়ে একবার চোখ মেললেন, আবার বুজলেন। কিছুক্ষণ বাদে আবার চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন শূন্যদৃষ্টিতে। মশারির বাইরে ছুটো মশা পিন্‌পিন্‌ করে বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে একটা সুবিধামতন ফুটো খুঁজে বার করার জন্য। হৃষীকেশের একটি হাত মশারির গায়ে পড়তেই একটা মশা বাইরে থেকেই হুল ফুটিয়ে দিল।

এবার হৃষীকেশ জেগে উঠলেন পুরোপুরি। মুখখানা বিমর্ষ। একটা হাত রাখলেন নিজের বুকে। দুঃস্বপ্ন দেখেছেন তাই ধড়ফড় করছে বুক। অলকার দিকে একবার তাকালেন। তারপর মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে টি-পয়ের ওপর রাখা জলের গেলাসটা নিতে গেলেন। এই সুযোগ বাকি মশাটা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাঁর হাতে, কিন্তু সময় কম বলে সুবিধে করতে পারলো না।

জল খেয়ে হৃষীকেশ একটু সুস্থ হলেন, মুখের বিমর্ষ ভাবটা খানিকটা কেটে গেল। কিন্তু চোখ মেলেই শুয়ে রইলেন। ঘুম আসছে না। বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে! একটা কিসের যেন শব্দ হচ্ছে, বাড়ির ভেতরেই। হৃষীকেশ কান পেতে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করলেন। কেউ কোনো দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে? কিন্তু শব্দটা বেশ খানিকক্ষণ অন্তর অন্তর। কেউ কি মেপে মেপে সময় নিয়ে তারপর ধাক্কা দিচ্ছে ওরকম? কিন্তু কে ওরকমভাবে···চোরটোর হলে তো ধাক্কা দেবে না—

আর একবার শব্দটা শুনেই হৃষীকেশ উঠে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে অলকার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে পড়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়তে পারেন অলকা, আবার খুব সহজেই ঘুম ভেঙে যায়। জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ?

হৃষীকেশ বললেন, একটা কি যেন শব্দ হচ্ছে?

—কোথায় শব্দ?

তখন আর কোনো শব্দ নেই। হৃষীকেশ দু মিনিট অপেক্ষা করলেন, তবু অলকাকে কোনো শব্দ শোনাতে পারলেন না। অলকা তো অবিশ্বাস করবেনই এর পর। কিন্তু হৃষীকেশ তো আর নিজের কানকে অবিশ্বাস করতে পারেন না। তিন চারবার শুনেছেন। ব্যাকুলভাবে আবার শব্দটার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। অলকা বললেন, ও কিছু নয়, ঘুমোও।

আর একবার শব্দ হতেই প্রায় খুশী হয়ে উঠলেন হৃষীকেশ।—ঐ যে, শুনেছ? শুনেছ এবার?

অলকা বিচলিত হলেন না, বললেন, জানলাটায় শব্দ হচ্ছে। হাওয়া দিচ্ছে তো—

—কোন্ জানলা?

ঘরে শুয়ে শুয়েই যেন দেখতে পাচ্ছেন এই ভঙ্গিতে অলকা বললেন, দালানের একেবারে শেষ দিককার জানলাটা।

—কিন্তু ও জানলা তো আমি নিজের হাতে বন্ধ করেছি!

আর একবার শব্দটা হতেই নির্ভুলভাবে বোঝা গেল, জানলারই শব্দ। হাওয়ায় সেটা একবার খুলছে একবার বন্ধ হচ্ছে। অলকা বললেন, থাক, আর উঠতে হবে না—ও জানলা খোলা থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই।

—কিন্তু শোনো, আমার স্পষ্ট মনে আছে, ও জানলা আমি নিজে বন্ধ করেছি।

—তারপর খুলেটুলে গেছে বোধ হয়!

—ছিটকিনি বন্ধ করলাম, কি করে খুলবে?

—তুমিই তা হলে ভুলে গেছ। বন্ধ করো নি—

—না, আমার স্পষ্ট মনে আছে—

—থাকগে, কি আর হবে।

হৃষীকেশ সন্তুষ্ট হলেন না। মুখে আবার সেই বিমর্ষ ভাবটা ফিরে এল। আপন মনে বললেন, সব কিছুর একটা মানে থাকা চাই তো! নিজে বন্ধ করেছি, সেই জানলা যদি খুলে যায়—আজকাল চারদিকে নানান অশুভ চিহ্ন দেখছি, বুঝলে! সেদিন চশমাটা হাত থেকে রাস্তায় পড়ে গেল—কোনো দিন এ রকম হয় না আমার—এই সব চিহ্ন ভালো না। একটা কিছু অমঙ্গল আসছে। ভাবছি গুরুদেবকে একবার আসবার জন্য খবর দেব—

—তাই দিও।

—পরেশ আপত্তি করে। ও গুরু-টুরু মানে না। কিন্তু আমার যে মন দুর্বল। মন শক্ত থাকলে গুরুর দরকার হয় না—কিন্তু এই সব দেখলে আমি

ঠিক থাকতে পারি না। কাল আমার অফিস ঘরের বারান্দায় একটা কাক মরে ছিল। মরা কাক আগে দেখেছো কখনো? আমারই অফিস ঘরের বারান্দায়—আর সেটাকে ঘিরে তিন চারশো কাকের মেলা, অসহ্য ডাকাডাকি—আমার এমন মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুঝতে পারছি, একটা কিছু অমঙ্গল আসছে।

—ঠিক আছে, গুরুদেবকে আসতে বলো।

—একটু আগে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম যে, আমার কপালে একটা আঁব—

—কাল সকালে শুনব। এখন ঘুমোও তো। রাত্তিরে ঘুম না হলেই তো তোমার অম্বল হয়—

স্বপ্নের কথাটা বলতে না পেরে হৃষীকেশ মনে মনে একটু আহত হলেন। কিছুক্ষণ চোখ মেলে শুয়ে রইলেন নিঃশব্দে। তারপর আবার উঠে বসে বললেন, নাঃ, যাই, জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। ওরকম ঠক্‌ঠক্ শব্দ হলে আমার ঘুম আসবে না!

অলকা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আবার জেগে উঠে বললেন, তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি।

—না, না, তুমি ঘুমোও না, আমিই দিয়ে আসছি বন্ধ করে।

—তোমায় যেতে হবে না।

স্বামী স্ত্রী দুজনেই বেরুলেন মশারি থেকে। ঘরের দরজা খুলে দালানে এসে দেখলেন, অলকার কথাই ঠিক। জানলাটা খোলা, হাওয়ায় ঠক্ ঠক্ করছে। হৃষীকেশ তবু অপ্রসন্ন হয়ে রইলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, তিনি জানলা বন্ধ করেছিলেন, অথচ···। বললেন, গুরুদেব এখন আসানসোলে আছেন নিত্যানন্দর কাছে—কালই চিঠি লিখবো।

জানলা বন্ধ করতে গিয়ে অলকা দেখলেন জয়শ্রীর ঘরে আলো জ্বলছে। স্বামীকে বললেন, তুমি শুতে যাও, আমি বাথরুম ঘুরে আসছি। মিঠুটা আজও আলো জেলে ঘুমিয়েছে!

হৃষীকেশ ঘরে ফিরে যাবার পর অলকা মৃদু গলায় দু'বার মিঠুর নাম ধরে ডাকলেন। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। জয়শ্রী বেশীর ভাগ রাত্তিরেই দরজা বন্ধ করে না—মা বাবা ছাড়া আর তো কেউ শোয় না তিনতলায়।

অলকা ঢুকে দেখলেন মাথার কাছে কাগজ আর কলম ছড়ানো, কি যেন লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছে জয়শ্রী। অলকা বিছানার কাছে এসে দাঁড়িয়ে

ইতস্তত করতে লাগলেন। শেস পর্যন্ত আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে তুলে নিলেন প্যাডটা। কি লেখা দেখবেন—এই আশঙ্কায় বুক কাঁপছিল। তা ছাড়া, মেয়ে যদি জেগে উঠে দেখে ফেলে—তাহলেও খুব রাগারাগি করবে।

সে-রকম কিছুই লেখা নেই অবশ্য। শ্রীলেখা বলে ওর এক বান্ধবীকে চিঠি লিখছিল জয়শ্রী। শ্রীলেখাকে চেনেন অলকা, জয়শ্রীর সঙ্গে কলেজে পড়তো, গত বছর বিয়ে হয়ে গেছে, এখন দুর্গাপুরে থাকে। নিছক মামুলি চিঠি—তাও আট দশ লাইন লিখে আর শেষ করেনি—পাতা জুড়ে আঁকিবুকি কেটেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে প্যাডটা রেখে দিতে যেতেই ভেতর থেকে তার একটা চিঠি খসে পড়লো। সেটা তুলে অন্যমনস্কভাবে খুলেই দেখলেন সম্বোধনে লেখা রয়েছে, শান্তনু, শান্তনু।

অলকার শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠলো। আবার সেই ছেলেটাকে চিঠি লিখেছে? এত করে বারণ করলাম, তবু কথা রাখলো না মিঠু! এইসব ছেলেমেয়েরা ভাবে কি! ওরা কি বোঝে না যে, বাপ মায়েরা ওদের কিসে ভালো হবে, সেই কথাই ভাবে সব সময়? ওদের যাতে সত্যি ভালো হবে, তাতে কখনো বাপ-মা বাধা দিতে পারে? শুধু চোখের নেশায়—

প্রচণ্ড ইচ্ছে সত্ত্বেও তক্ষুনি চিঠিটা খুলে পড়তে পারলেন না অলকা। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কি জানি চিঠির মধ্যে কি থাকবে, পড়ে কতখানি আঘাত পেতে হবে। দু'বার নাম লিখে সম্বোধন, এ আবার কি ফ্যাশান!

ছেলেটিকে দেখেছেন অলকা। দেখতে শুনতে তো ভালোই, জাতের অমিল আছে—তাতে অলকার অবশ্য বিশেষ আপত্তি নেই, আজকাল তো এরকম কতই হচ্ছে—মিঠুর বাবার অবশ্য আপত্তি খুব, তবে সে তিনি বুঝিয়ে সুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী করতে পারতেন। কিন্তু আর একটা ব্যাপার—মিঠু কিছুদিন ঐ ছেলের কাছে কলেজে পড়তো—সেইজন্যই তো ওঁর এত রাগ। হৃষীকেশের ধারণা, যে মানুষ নিজের ছাত্রীর সঙ্গে প্রণয় করে, তার চরিত্রবল বলতে কিছু নেই। আর যে পুরুষের চরিত্রবল নেই, সে কি একটা মানুষ! রাস্তায় ঘাটে যে-সব ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে, তারা তো লোফার! যুগ অনেক পাল্টে গেছে, কিন্তু উনি কিছুতেই এসব মানবেন না।

চিঠিখানা হাতেই রইলো, জয়শ্রীর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখে জল এসে গেল অলকার। এই তাঁদের প্রথম সন্তান, কত যত্নের, কত আদরের! ও যখন হয়, তখন তাঁদের অবস্থা এত ভালো ছিল না,

কিন্তু মেয়েকে কোনোদিন কোনো কষ্ট সইতে দেননি। ও এখন যেখানে সেখানে গিয়ে বাপ-মাকে ছেড়ে কষ্ট সহ্য করতে পারবে? ও যখন জন্মালো, মনে হয় এই তো সেদিনের কথা দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেল। তিনচার বছর আগেও তো রাত্তিরে ভূতের ভয় পেয়ে ও বাবাকে কিংবা মাকে ডাকতো মাঝ রাত্তিরে। আর আজ ওর নিজস্ব মতামত এমন প্রচণ্ড হয়ে উঠলো যে, আর কারুর কথাই শুনবে না! বিয়ের পর মেয়ে অন্য বাড়িতে গিয়ে থাকবে—এ কথা ভাবতেই কষ্ট হয় অলকার—আর সে যদি তাঁদের অমতে জোর করে কোথাও···

বাড়ি একেবারে খালি হয়ে গেছে। জয়শ্রীর পিঠোপিঠি পরের ভাই সুব্রত গত বছর চলে গেছে জার্মানিতে। স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে জীবনে উন্নতি করবে, তাকে আটকানো যায়নি। ছোট ছেলে সব্যসাচীর বয়েস চোদ্দ, পড়াশুনোয় খুব অমনোযোগী হয়ে উঠেছিল, কর্তা তাকে পাঠিয়ে দিলেন দেওঘরের বিদ্যাপীঠে, ওখানে কড়া নিয়ম কানুনে থেকে যদি মানুষ হয়। অলকার দেওর পরেশ আর তার স্ত্রী সুজাতার তো কোন ছেলেপুলে হলো না। বাড়িতে এখন এই এক মেয়ে—এই মেয়ে পরের ঘরে চলে যাবে? বাপ মায়ের কথা না ভেবে··

চিঠিটা পড়লেন না অলকা, তাঁর মর্যাদায় বাধলো। তাঁর মেয়েও জানে যে, মা লুকিয়ে চিঠি পড়েন না—তাই সে সাবধান হয়নি। কিন্তু অলকা রাগ সামলাতে পারলেন না, কিছু না ভেবেই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠিটা। এতে কোনো লাভ হবে না, জয়শ্রী তো আবার একটা চিঠি লিখতে পারে—কিন্তু সে কথা ভাবার মতন মনের অবস্থা নেই।

ছেঁড়া টুকরোগুলো হাতে নিয়ে দলা পাকাতে লাগলেন। তারপরই তাঁর কি রকম সন্দেহ হলো। এ হাতের লেখা তো জয়শ্রীর নয়।

ব্যস্ত হয়ে অলকা তখন আবার টুকরোগুলো জোড়া দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু এত কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছেন যে, আর জোড়া দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটা জয়শ্রীর হাতের লেখা হতেই পারে না। অন্য চিঠিটার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তিনি আরও নিশ্চিন্ত হলেন। চিঠি লেখার ব্যাপারে বরাবরই খুব আলস্য জয়শ্রীর। আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে তো বলে বলে সাত দিনেও একটা চিঠি লেখানো যায় না—তাও চার পাঁচ লাইনে সেরে দেয়। কিন্তু জয়শ্রীর চিঠির প্যাডে শান্তনুকে লেখা অন্য কারুর চিঠি, এর মানে কি? মেয়েলি হাতের লেখাই তো মনে হয়।

রীতিমতন বিভ্রান্ত বোধ করলেন অলকা, চিঠির টুকরোগুলো নিয়ে কি

করবেন বুঝতে পারলেন না। কাল খুঁজে না পেয়ে জয়শ্রী ভাববে, সে নিজেই অন্য কোথাও ভুলে রেখেছে। টুকরোগুলো ঘরে ফেলা চলবে না। জানলার খড়খড়ি সামান্য ফাঁক করে সেগুলো বাইরে ফেলে দিলেন, প্রবল হাওয়ায় সেগুলো কোথায় উড়ে যাবে তার ঠিক নেই।

বিচিত্র মনোভাব নিয়ে অলকা আবার তাকালেন জয়শ্রীর দিকে। এই তাঁর মেয়ে, তার শরীরের মধ্যেই একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে—এতখানি বড় হলো তাঁর চোখের সামনে। মাঝে মাঝে মামারবাড়িতে গিয়ে দু'এক মাস থাকে—এ ছাড়া এই তেইশ বছরের মধ্যে একটি দিনের জন্যও মেয়েকে চোখের আলগা করেননি অলকা। ও কি খেতে ভালোবাসে, কোন রংটা ওর বেশি পছন্দ, কখন ওর শরীর খারাপ হয়—এ সবই তিনি জানেন, অথচ ওর মনটা কোনদিকে যাচ্ছে—এটা কিন্তু বোঝেন না। বাবা-মাকে কম ভালোবাসে না জয়শ্রী, অথচ সে কি করে বাবা মাকে এতবড় আঘাত দিতে চায়?

খুব টান টান করে চুল বেঁধেছে জয়শ্রী, মুখ ভর্তি ক্রিম, কপালে একটা সবুজ টিপ পরেছিল, সেটা মুছে গেলেও একটু অস্পষ্ট দাগ আছে—কুঁকড়ে মুকড়ে খানিকটা অসহায়ের মতন ঘুমিয়ে আছে। বালিশ থেকে নেমে গেছে মাথা, তার ফর্সা মুখখানাতে দু'এক বিন্দু ঘাম—ঘুমের মধ্যে এখনো তাকে শিশুর মতন দেখায়। মায়ায় বুকটা মুচড়ে উঠলো অলকার। নিচু হয়ে তিনি ওর মাথার বালিশটা এনে দিলেন—পায়ের কাছে শাড়ীটা একটু উঠে গিয়েছিল, ঠিক করে দিলেন সেটা। জয়শ্রী মশারি টাঙাতে চায় না, সারা রাত পাখা চালিয়ে শোয়। এখন শেষ রাতে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়ছে, অলকা পাখার স্পিডটা কমিয়ে আলো নিবিয়ে দরজা ভেঁজিয়ে বেরিয়ে এলেন।

নিজের ঘরে এসে দেখলেন, হৃষীকেশ এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন তাঁর চোখে গভীর ঘুম। স্বামীর সঙ্গে মেয়ের বিষয়ে দু'একটা কথা বলার ইচ্ছে ছিল অলকার—কিন্তু ডাকলেন না। শুয়ে পড়ার পর অলকার কিন্তু আর চট্ করে ঘুম এলো না। এবার তাঁর জেগে থাকার পালা। শুয়ে শুয়ে চোখ মেলে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

॥ ৩ ॥

ওলো রেখে দে, সখী
রেখে দে, মিছে কথা
ভালবাসা—

—রবীন্দ্রনাথ

বাড়ি ফেরাব সময় প্রত্যেকদিন অনুরাধার একটু একটু মন খারাপ লাগে। বাস থেকে নেমে মিনিট দু'এক হাঁটতে হয়, তারপর তিনতলায় অনুবাধাদের ফ্ল্যাট। তবু এইটুকু সময়ের জন্যই যেন মনে হয়, তাকে পেবিয়ে আসতে হয় অনেকটা বাস্তা, অনেক বাধা।

মোডেব চায়ের দোকানটা ছোট, কিন্তু সেখানকার চায়ে কি একটা টান আছে যে সব সময়ই ভিড। দোকান উপচে রাস্তাতেও লোক চলে আসে, অনেকে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খায। সেইটুকু বাস্তা পেরুবার সময় অনুবাধা সর্বাঙ্গে একটা অদৃশ্য বর্ম পবে থাকে। ঠিক তাকে উদ্দেশ্য কবে কেউ কোনোদিন কোনো খাবাপ কথা বলেছে কি না তা অবশ্য সে জানে না, তবে অনেক খারাপ কথা তার কানে আসে।

ছেলেরা এই সব খাবাপ কথা বলে কি যে আনন্দ পায় কে জানে! অথচ, যে-সব ছেলেদেব সঙ্গে তার সামনাসামনি দেখা হয়েছে বা কথা বলেছে—তারা তো কেউ কখনো এরকম কথা বলে না। সেই সব ছেলেদের সঙ্গে এই সব ছেলেদের চেহারায় সাজপোশাকে কোনো তফাতও তো নেই। তবে কি সব ছেলেদেবই আড়ালের ভাষা এই বকম? ওরা যে বকম কথা বলে, তাতে মনে হয়, ছেলেদের কাছে মেয়ে মানেই একটা শরীর, লোভনীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমেত একটা উপভোগ্য শরীর, আর কিছু নয়। অথচ এই ছেলেদেব অনেকেরই বযেস তাব সমান বা তার চেয়েও কম।

উল্টো ফুটপাথ দিয়েও যাবার উপায় নেই, ওখানে অনেক দিন ধরে খোঁড়া-খুঁড়ি করে রাস্তাটা যাচ্ছেতাই করে রেখেছে। তাও পাশ দিয়ে যাবার চেষ্টা করা যায়—কিন্তু ওখানেই তার বাবার এক বন্ধুর বাড়ি। তিনি বা তাঁর বাড়ির কেউ দেখলেই অনুরাধাকে ডাকবেন—কিন্তু প্রত্যেকদিন তো আর একই ধরনের কথা বলার মতন মনের অবস্থা থাকে না মানুষের।

সেই পথটুকু পেরিয়ে আসে অনুরাধা মাথা নিচু করে। বাড়িতে ঢোকার মুখে আর এক অস্বস্তি। অঞ্জনের সঙ্গে দেখা হবেই। অঞ্জন যে কি করে ঠিক অনুরাধার বাড়ি ফেরার সময়টা টের পেয়ে যায়, তা কে জানে! অঞ্জনও নিশ্চয় মোড়ের চায়ের দোকানটায় আড্ডা দেয়, অনুরাধাকে আগে থেকে দেখতে পেয়েই চলে আসে। অঞ্জন অনুরাধার চেয়ে বয়েসে দু' বছরের ছোট, বি. এস-সি পাস করে বেকার বসে আছে।

অঞ্জন বললো, টুকুদি, তোমার একটা চিঠি!

চিঠির কথা শুনলেই অনুরাধার বুকের মধ্যে ধক্ করে ওঠে। শরীরটা আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যে বিশেষ চিঠির জন্য সে প্রতীক্ষা করছে, সে এখন জেনে গেছে, সে চিঠি আর কোনদিনই আসবে না!

খামটার দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলো, একটা মামুলি ব্যাপারের চিঠি। মুখটা সামান্য কঠিন করে বললো, তোমার হাতে কেন? লেটার বক্সে দেয়নি?

অঞ্জন এক গাল হেসে বললো, তুমি ছাখো নি? তোমাদের লেটার বক্স কোথায়?

দেয়ালের গায়ে যেখানে লেটার বক্সটা লাগানো ছিল, সেখানে শুধু একটা চৌকো দাগ। লেটার বক্স অদৃশ্য।

—কি হলো, কোথায় গেল?

—যেখানে যায়! গত সপ্তাহে আমাদেরটা গেছে, এবারে তোমাদেরটা। প্রণবেশদা'দেরটা তবু আছে এখনো—

—বাঃ, সকালবেলাই তো দেখে গেলাম।

—ঠিক মনে আছে আজ সকালে দেখেছিলে?

অনুরাধা বেরিয়েছে ভোরবেলা, তখন সে লেটার বক্সটা দেখেছিল কিনা তা মনে নেই অবশ্য, তবু সে খুব জোর দিয়ে বললো, হ্যাঁ, দেখেছিলাম!

—তাহলে তার পরেই কেউ নিয়েছে!

—দিনের বেলা চুরি করে নিয়ে গেল, তুমি দেখতে পারলে না?

—তবু যদি বলতে, তাহলে সব সময় দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতাম।

আর কথা বাড়াবার ইচ্ছে নেই অনুরাধার। অনুরাধার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ খোঁজার জন্য অঞ্জন নিজেই যদি সেটা সরিয়ে থাকে, তাহলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিছুদিন আগে তাদের সিঁড়ির আলোটা যখন চুরি যায়—তখন অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে অঞ্জনই তাকে সেই খবরটা দিয়েছিল।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল—এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো, অঞ্জন সেটা খুলেছিল। আঠা লাগাবার জায়গাটা এখনো ভিজে।

—অঞ্জন, তুমি আমার চিঠি খুলেছিলে ?

—সে কি, টুকুদি, আমি তোমার চিঠি খুলবো কেন ?

আঙুল দিয়ে টানতেই চিঠির মুখটা নরমভাবে খুলে গেল। বিষণ্ণ হয়ে এলো অনুরাধার চোখ দুটো, অঞ্জনের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললো, এইরকমভাবে পোস্ট অফিস থেকে চিঠি আসে ?

—সেটা পিওনকে জিজ্ঞেস করো—

অঞ্জনের মুখে প্রচ্ছন্ন হাসি। নিজের দুষ্কৃতি লুকোবার চেষ্টাও তার নেই। বয়েসে ছোট হলেই যে ছেলেরা মেয়েদের দিদির সম্মান দেবে—এটা এখন ভুল ধারণা। অঞ্জন অনুরাধাকে গোপনে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়—কে জানে এ নিয়ে সে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলেছে কি না। অনুরাধা মাঝে মাঝে যে বেনামী চিঠি পায়—তার দৃঢ় ধারণা অঞ্জনই সেগুলো লেখে। এমন কি তার কলেজে যে একদিন ভূত-টেলিফোন কল পেয়েছিল, গলার আওয়াজের বিকৃতি সত্ত্বেও সে অঞ্জনকে চিনতে পেরেছিল।

চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে অঞ্জনের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, নাও। যত ইচ্ছে পড়ো। আমি চাই না এই চিঠি !

রাগ করে অনুরাধা দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। অঞ্জন তাকে যতই জ্বালাতন করুক, যতই তার চিঠি খুলে পড়ুক, তার কিছু করার উপায় নেই। এসব ক্ষেত্রে মেয়েরা অসহায়। এ নিয়ে চ্যাঁচামেচি করলে অনুরাধার আত্মসম্মান আহত হবে। সে কি অঞ্জনের বাবাকে গিয়ে বলবে, কাকাবাবু, আপনি আপনার ছেলেকে সামলান ! অবাস্তব কথা ! এসব ক্ষেত্রে সবাই মেয়েদেরই দোষ দেয়। অঞ্জনের বাবা যদি বলেন, এত মেয়ে থাকতে তোমার সঙ্গেই ও এরকম করে কেন বলো তো মা ?

সেইটাই তো প্রশ্ন, অঞ্জন কেন তাকে এরকম জ্বালাতন করে। সে কি তার বয়েসী বা ছোট কোনো মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারে না ? বয়েসে ছোট হয়েও অঞ্জন তাকে প্রেম জানাতে চায় ! ব্যাপারটা ভাবলেই হাসি পায় অনুরাধার। সে যাই হোক, প্রেম জানাবার ভাষাটাও শেখেনি। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকা, বেনামী চিঠি, টেলিফোনে ভয় দেখানো—এই কি প্রেমের ভাষা ?

অঞ্জন তরতর করে উঠে এসে খপ্ করে অনুরাধার একটা হাত ধরে বললো, তুমি রাগ করলে টুকুদি ? চিঠিটা নিয়ে যাও !

আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে অত্যন্ত কাতর ম্লান গলায় অনুরাধা বললো,

অঞ্জন, তুমি আমার সঙ্গে এরকম কেন করো বলো তো! কি লাভ হয় তোমার ?

—বাঃ, আমি কি করেছি! সত্যি বলছি, আমি তোমার চিঠি খুলিনি। খামটা খোলাই ছিল, আমি বরং জুড়ে দিলাম।

—আচ্ছা ঠিক আছে।

—টুকুদি শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

—এখন আমার সময় নেই, একটুও সময় নেই—

দোতলার ফ্ল্যাটটা প্রণবেশদার। এ ফ্ল্যাটের দরজা কোনোদিন বন্ধ থাকে না। তার কারণ আছে, ডান পাশে আর পেছনে কাছাকাছি বাড়ি বলে হাওয়া আসে না—পুব দিকের জানালাটাই যা খোলামেলা—দরজা খোলা রাখলে তবু একটু হাওয়া চলাচল করতে পারে।

দরজার সোজাসুজি ঘরের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়, প্রণবেশদা কোনো বই পড়ছেন। চোখাচোখি হয়ে গেলেই প্রণবেশদা ডাকেন। না ডাকলেও অনুরাধা মাঝে মাঝে নিজে থেকেই যায়। প্রণবেশদার স্ত্রীর অসুখ, আড়াই বছর ধরেই শয্যাশায়ী, বোধহয় আর সারবেই না। মেরুদণ্ডের হাড় সরে গেছে, প্রণবেশদার স্ত্রী বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না—কখনো উঠলেও ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। প্রণবেশদার একটি পাঁচ বছরের মেয়ে আছে। একটি বুড়ি বিধবা—রান্নাবান্না করে দেয়, মেয়ের দেখাশুনা করে। সপ্তাহে দু'দিন ডাক্তার আসে নিয়মিত।

অনুরাধা প্রায়ই গিয়ে প্রণবেশদার স্ত্রীর খোঁজ খবর নেয়, মেয়েটিকে আদর করে অনেক সময় তাকে নিয়ে আসে নিজেদের ফ্ল্যাটে। প্রণবেশদার জন্য মায়া হয় অনুরাধার। প্রণবেশদা ধীর শান্ত মানুষ, মুখে কোনো অভিযোগ নেই, স্ত্রীর সেবা করেন প্রাণ দিয়ে, মেয়েটা কখনো বেশী কাঁদলে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সামলান—কিন্তু প্রণবেশদার জীবনটা শেষ হয়ে গেছে। স্ত্রীর অসুখ আর সারবে না—প্রণবেশদাকে জীবনে আরও অনির্দিষ্ট অনেকগুলো বছর এই-রকম নিস্তরঙ্গভাবে কাটাতে হবে।

একটা বিলিতি কোম্পানিতে মোটামুটি ভালোই চাকরি করেন প্রণবেশদা। কিন্তু প্রত্যেকদিন অফিস ছুটি হলেই বাড়ি ফিরে আসেন। সিনেমা থিয়েটার দেখা কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারার কোনো ইচ্ছেই যেন ওঁর নেই। প্রণবেশদার স্বভাবই এমন যে বাড়িতে রুগ্না স্ত্রী আর শিশুকন্যাকে ফেলে দায়িত্বজ্ঞানহীন বেপরোয়া হওয়া সম্ভবই নয় তাঁর পক্ষে। অফিসের কাজে

মাঝে মাঝে দু' এক সপ্তাহের জন্য বাইরে যেতে হয়—তখন এক পিসীমাকে এনে রেখে যান। তিনি অবশ্য নিজের সংসার ছেড়ে এখানে এসে থাকতে খুব একটা আনন্দের সঙ্গে রাজী হন না।

প্রণবেশদার একমাত্র নেশা বই-পড়া। স্ত্রীর চিকিৎসা ছাড়া বাকি সব টাকাতেই বোধহয় বই কিনে ফেলেন। অনুরাধা এ পর্যন্ত প্রণবেশদার মতন এমন শিক্ষিত ও জ্ঞানী লোক আর দেখেনি। অথচ প্রণবেশদার চাকরির সঙ্গে বই পড়ার কোনো সম্পর্ক নেই, উনি লেখক টেখকও নন। নিছক গল্প উপন্যাসও নয়, প্রণবেশদা পড়েন ইতিহাস, বিভিন্ন যুদ্ধের সেনাপতিদের স্মৃতি-কথা, ভ্রমণ কাহিনী আর দর্শন। প্রণবেশদা কিন্তু কখনো বিদ্যাজাহির করার চেষ্টা করেন না, আস্তে আস্তে কথা বলেন। উত্তেজনা জিনিসটাই যেন ওঁর চরিত্রে নেই—প্রণবেশদার সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে অনুরাধার। না, তা ঠিক নয়, আগে লাগতো এখন আর লাগে না।

একদিন প্রণবেশের মেয়ে রিনি কি একটা ব্যাপার নিয়ে দারুণ কান্নাকাটি করছিল, প্রণবেশদা কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না। মায়ের হাতের যত্ন পায়নি যে মেয়ে, সে তো জেদী হবেই। বিছানা থেকে ওর মা অনর্থক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে। অনুরাধা সেই সময় সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল। সে ঢুকে পড়ে বলেছিল, দিন, আমি ওকে ওপরে আমাদের ওখানে নিয়ে যাই।

রিনি কিছুতেই যাবে না, অনুরাধার কোলে উঠেও হাত পা ছুঁড়তে লাগলো। হিস্টিরিয়ার মতন। তবু জোর করে নিয়ে এলো অনুরাধা। অনেক কষ্টে ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠাণ্ডা করার পর একটু বাদেই সে ঘুমিয়ে পড়লো, তখন অনুরাধা তাকে কোলে করে নিচে নেমে এলো।

প্রণবেশ কৃতজ্ঞভাবে হেসে বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছে, বাঃ! ওকে এখানেই শুইয়ে দাও। ওর মা-ও একটু ঘুমিয়েছে—রাত্তিরে তো ঘুমোতেও পারে না—।

হাতের মোটা ভারী বইটা মুড়ে রেখে প্রণবেশ ঘুমন্ত মেয়ের কপালের চুল সরিয়ে একটু আদর করলেন। আপন মনেই বললেন, আর দু'তিন বছরেই অনেকটা বড় হয়ে যাবে—তখন নিশ্চয়ই অনেকটা বুঝতে পারবে। ও এরকম করলে ওর মা আরও বেশী কষ্ট পায়।

তারপর অনুরাধার দিকে ফিরে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন বসো!

অনুরাধা বললো, না, আমি আর বসবো না, আমি এবার যাই!

একটু বসো!

খাটের ওপর বসে একটা সিগারেট ধরালেন প্রণবেশ। পাজামা আর গেঞ্জি পরা, চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস, মুখে একটা শান্ত উদাসীনতা।

প্রণবেশ জিজ্ঞেস করলেন, কাল আর পরশু তোমাকে দেখিনি—বাইরে কোথাও গিয়েছিলে নাকি? সব মিলিয়ে তিন চারদিনই তোমাকে দেখতে পাইনি—

অনুরাধা একটু লজ্জা পেল। সত্যি, এ ক'দিন ওঁদের কোনো খোঁজখবর নিতে আসা হয়নি। বললো, না, এখানেই ছিলাম। তবে, আমাদের কলেজের মেয়েদের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে, তাই একটু ব্যস্ত—

—তোমার কলেজ তো অনেকটা দূর—যেতে আসতেই তো অনেকটা সময় চলে যায়—

—তা প্রায় দু'আড়াই ঘণ্টা লাগে।

—এতটা সময় নষ্ট হয়! এদিকে কাছাকাছি কোনো কলেজে চাকরি পেতে পারো না!

—পাওয়া শক্ত, তবে আমি চেষ্টাও করি না। আমি অনেকটা ইচ্ছে করেই দমদমের কলেজে কাজটা নিয়েছি!

—কেন?

—এমনিতে কলেজে পড়ানোর ইচ্ছেই আমার ছিল না। স্কুল-কলেজে চাকরি করলে সব সময় কিরকম একটা দিদিমণি দিদিমণি হয়ে থাকতে হয়। রাস্তাঘাটে ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াবার উপায় নেই—দু পা যেতে না যেতেই কোনো ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে—তবু দমদমের ছাত্রীদের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতায় দেখা হবার সম্ভাবনা কম—তাও দেখা হয় মাঝে মাঝে।

বলতে বলতে হেসে উঠলো অনুরাধা। প্রণবেশও সামান্য হেসে বললেন, তা সত্যি, এম. এ. পাস করেছো বটে, কিন্তু অধ্যাপিকা হিসাবে তোমাকে ঠিক মানায় না।

সঙ্গে সঙ্গে, কথাটা মেনে নিয়ে অনুরাধা বললো, ঠিকই বলেছেন, এম. এ. পাস করেছি বটে কিন্তু লেখাপড়া কিছুই শিখিনি। আপনার সঙ্গে কথা বললে বুঝতে পারি!

—আমি সে কথা বলছি না। শুধু পড়াশুনো নয়, অধ্যাপিকা হতে গেলে, আমার মনে হয় চরিত্রের গড়নটাও একটু অন্যরকম হওয়া দরকার। তুমি একটু হালকা ছটফটে ধরনের—

—আপনাকে অধ্যাপক হলে খুব মানাতো। আপনি এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্রফেসারি করুন না। তাতে ছাত্রদের উপকার হবে। এত যে পড়ছেন—

সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রণবেশ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বুঝি ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে ?

—খুব। বাড়িতে আর কতক্ষণ থাকি। মা এত বকুনি দেন—আমার ইচ্ছে করে নানা দেশে ঘুরে বেড়াই—ইওরোপ, আফ্রিকা—

অপ্রত্যাশিতভাবে গলার স্বর অবেদনময় কাতর করে প্রণবেশ বললেন, তোমাকে একটা অনুরোধ করবো, তুমি রাখবে ?

অনুরাধার একটু অনুতাপ হলো, যার স্ত্রী আড়াই বছর ধরে শয্যাশায়ী এবং যিনি অফিস যাওয়াটুকু ছাড়া ঘরের বার হন না—তাঁর কাছে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার এই ভ্রমণলিপ্সার কথা প্রকাশ না করাই উচিত ছিল। এও যেন দরিদ্রের সামনে ধনীর অহংকারের মতন একটা অপরাধ।

—কি বলুন ?

—তুমি প্রত্যেকদিন, অন্তত একবারের জন্যও আমাদের এখানে আসবে ? সকালে বা সন্ধ্যের পর—অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যও।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আসবো। বৌদিকে আর রিনিকে দেখে যাবো। আমাদের তো আসাই উচিত।

—আমি যখন থাকবো—তুমি যদি একটু সময়ের জন্যও রোজ আসো, আমি তোমার কাছে সারা জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো।

—কেন, একথা বলছেন কেন ?

প্রণবেশের খাট থেকে অনুরাধার চেয়ারটা অন্তত চার হাত দূরে। খাট থেকে উঠলেন না প্রণবেশ, তবে মনে হলো, তিনি যেন শুধু দৃষ্টি দিয়েই শারীরিকভাবে স্পর্শ করলেন অনুরাধাকে। তাঁর দৃষ্টি গাঢ় ও ব্যাকুল। খুব বিষণ্ণভাবে বললেন, তোমাকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে। তোমাকে দেখলে আমার বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভালোলাগা—

চঞ্চলা হয়ে অনুরাধা উঠে দাঁড়াতে গেল। প্রণবেশ খানিকটা আদেশ খানিকটা অনুনয় মিশিয়ে বললেন, যেও না, আর একটু বসো—। অনুরাধা, আমি আর কিছু চাই না, আমি তোমাকে কোনোদিন অপমান করবো না—শুধু একটু দেখতে চাই। তোমার এমন সুন্দর স্বাস্থ্য, এই ধারালো চেহারা, এতখানি লম্বা চুল, মুখের ঝলমলে হাসি, একটা ছটফটে ভাব—মেয়েদের এই রূপটা দেখার জন্য আমার ভেতরটা হা-হা করে—জানি না, কোনো অন্যায় বলছি কি না, কিন্তু তোমাকে অপমান করার একটুও ইচ্ছে নেই আমার—

পুরুষের এই ধরনের প্রত্যক্ষ স্তুতিতে অনুরাধার আনন্দ কিংবা রাগ—কোনোটাই হলো না, তার কিরকম ভয় ভয় করতে লাগলো। সব ব্যাপারটাই

যেন ভয়ের। এই প্রথম সে অনুভব করলো, সে একটি নির্জন ঘরে একজন বলশালী পুরুষের সামনে একা বসে অছে।

প্রণবেশ উঠে দাঁড়াতেই অনুরাধাও ত্রস্তে উঠে পড়লো চেয়ার থেকে। প্রণবেশ কিন্তু এগিয়ে এলেন না, অনুবাধার শরীর স্পর্শ করলেন না—কোনোরকম জোর দেখাবার কোনো স্পৃহাই নেই তাঁর—আগের মতনই বিষণ্ণ গলায় বললেন, এ আর কিছুই নয়—একটা সুন্দর জিনিসকে দেখার যে আনন্দ—

সেদিন অনুরাধা তাড়াতাড়ি চলে এসেছিল ওপরে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার বুক ধকধক করেছে। প্রণবেশ তাকে ভয় দেখায়নি, অথচ কি প্রচণ্ড কাল্পনিক ভয় তার সারা শরীরে।

তারপর থেকে সে আর খোলা মন নিয়ে প্রণবেশদের ঘরে যেতে পারেনি। প্রণবেশের সামনে দাঁড়ালেই তার অস্বস্তি হয়। প্রণবেশের চোখ যেন চুম্বকের মতন লেগে থাকে—অথচ আগে এরকম কখনো অনুভব করেনি। যে-লোক অসুস্থ স্ত্রীর সেবা করে যত্নভরে, যে লোকের চোখ অধিকাংশ সময়েই পুরোনো বইয়ের বিবর্ণ পাতায় ডুবে থাকে, সে-ই যখন অনুরাধার দিকে তাকায়—একেবারে অন্যরকম দৃষ্টি, ঠিক লোভ নয়—অথচ কিরকম যে—তা-ও বলা যায় না।

এখন সাধারণত দুপুরের দিকেই, প্রণবেশ যখন অফিসে থাকেন—অনুরাধা মাঝে মাঝে রুমা বৌদির খোঁজ নিতে যায়। আজকাল যেন তার মনে হয়—হয়তো সত্যি নয়—রুমা বৌদির নীরব চোখেও একটা ভর্ৎসনা। রুমা বৌদি বোধহয় ভাবছেন, তাঁর সচ্চরিত্র স্বামীটির মতিভ্রম ঘটাবার জন্যই অনুরাধা··।

অসুস্থ প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নিতে আসা, প্রণবেশদাকে সাহায্য ও সহানুভূতি জানানোর যে অন্য একটা মানেও থাকতে পারে—একথা অনুরাধা এতদিন বোঝেনি। ভাবতেই তার বিশ্রী লাগে। রুমা বৌদির মনের যন্ত্রণা বাড়াতে চায় না কিছুতেই অনুরাধা। এক এক সময় মনে হয়, সে যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো—তাহলে তো আর এইসব সমস্যা উঠতো না! ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পক্ষে পৃথিবীটা আরও বেশী জটিল।

একেবারে না এসেও পারে না। প্রণবেশদার মেয়ে রিনি তাকে ভালোবাসে—অনুরাধাও বাচ্চাদের সঙ্গে খুব ভাব জমাতে পারে—রিনি প্রায়ই তার হাত ধরে টেনে আনে। আর প্রণবেশদা তো তাকে দেখতে পেলে ডাকবেনই। এক একদিন প্রণবেশ শিশুর মতন অভিমানী গলায় বলেছেন, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো অনুরাধা?

—কেন, রাগ করবো কেন ?

—তুমি আর আসো না।

—আসি তো মাঝে মাঝে।

-যেদিন থেকে আমি তোমাকে অনুরোধ জানালাম, সেদিন থেকেই তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছো। আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি ? তোমাকে কখনো অপমান করেছি ?

উত্তর না দিয়ে অনুরাধা চুপ করে থাকে। প্রণবেশ উঠে দাঁড়ান, কাছে এগিয়েও আসেন কিন্তু অনুরাধার শরীর স্পর্শ করেন না। এমন কি স্নেহের অভিনয়েও কোনোদিন অনুরাধার গায়ে হাত রাখেন নি। দেয়ালের ক্যালেণ্ডারে একটা সমুদ্রের ছবি, দক্ষিণ ভারতের সমুদ্রের পারে এক প্রাচীন মন্দির—সেইদিকে তাকিয়ে প্রণবেশ দীন মানুষের মতন বলেন, আর কিছু না, তোমাকে শুধু একটু দেখতে ইচ্ছে করে—মদিগ্লিয়ানির আঁকা নারীদের মতন মুখ, সত্যিকারের যৌবন, হাসির সময় তোমার ভুরু দুটো যখন কাঁপে—তোমার মতন সুন্দর স্বাস্থ্য বাংলাদেশের আর কোনো মেয়ের আছে কিনা জানি না—একটু সুন্দর জিনিস দেখার যে আনন্দ···

এই সেই স্তুতি, অনুরাধার সারা শরীর ভয়ে কেঁপে ওঠে, আর এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারে না—তক্ষুনি ঐ ঘর ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছে করে। প্রণবেশদার ব্যক্তিত্বের জন্য তাঁর মুখের ওপর হেসে ওঠা যায় না—যদি হেসে উঠতে পারতো, অনুরাধা অনেকখানি স্বাভাবিক বোধ করতো।

আর সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় দেখলো, প্রণবেশদার ওখানে ডাক্তারবাবু এসেছেন, দরজার সামনেই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন তিনি। আজ আর ডাকার সুযোগ নেই, ওদিকে এক ঝলক তাকিয়ে একটু তাড়াতাড়ি উঠে এলো অনুরাধা। প্রণবেশ ওরই মধ্যে কথা থামিয়ে স্থির চোখে তাকালেন অনুরাধার দিকে—অনুরাধার মনে হলো তিনতলা পর্যন্ত সেই দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করে আসছে।

অনুরাধার বাড়িতে মা, বাবা, আর ছোট দুটি ভাইবোন। বোনটির বয়েস এগারো, ভাইয়ের তের! অনুরাধার দাদা বোম্বেতে চাকরি করে। দাদার সেখানে মন টিঁকছে না, কলকাতায় ফিরে আসতে চায়। অনুরাধা যদিও জানে, দাদার আর কলকাতায় ফেরা হবে না—অন্তত না ফেরাই ভালো। বৌদির সঙ্গে মা-বাবার মতে মেলেনি। দাদা খুব বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছে, বৌদি এ বাড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি। যদিও বাবাই বিয়ের সম্বন্ধটা এনেছিলেন। প্রকাশ্য ঝগড়া-ঝাঁটি হবার আগেই দাদা-বৌদি বোম্বেতে

চলে গেছে। আবার যদি কলকাতায় আসে, তাহলে ঝগড়া বাধবেই—তারপর যদি দাদা-বৌদিকে কলকাতায় আলাদা বাড়ি করে থাকতে হয়, তাহলে মা খুব দুঃখ পাবেন। তার থেকে এই তো ভালো, সব দিক বজায় আছে, দূর থেকে বৌদি বেশ ভক্তিপূর্ণ চিঠি লেখে বাবা আর মা-কে।

একটা ওষুধ কোম্পানিতে ভালোই চাকরি করতেন অনুরাধার বাবা, এখন রিটায়ার করে এক্সটেনশানে আছেন, তাও আর একবছর মাত্র। এই নিয়ে বাবার খুব মন খারাপ। চাকরি যাবার পর বুড়ো বয়েসে ছেলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে—এটা তাঁর কিছুতেই সহ্য হয় না—বিশেষত যে-ছেলে বিয়ের পব পর হয়ে গেছে। ছোট ছেলেমেয়ে দুটির লেখাপড়া এখনও বাকি। বছর ছয়েক আগে বাবার খুব গুরুতর অসুখ হয়েছিল, দাদার তখনো চাকরি হয়নি—সেই সময় বাবাব প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে অনেক টাকা তুলে আনতে হয়—সেইজন্য চাকরি ছাড়ার পর বিশেষ কিছু পাবেন না। রিটায়ার করার পর বাবা নিজেই একটা কিছু ব্যবসা শুরু করবেন—এই চিন্তায় এখন থেকেই ব্যস্ত, এবং সর্বক্ষণ ঘোরাঘুরি করেন।

অতদূরে গিয়ে কলেজে পড়ানোর চাকরি করতে ভালো লাগে না অনুরাধার, কিন্তু বুঝতে পেরেছে, সে চাকরি নেবার ফলে বাবা একটু খুশী হয়েছেন। তাই নিজের হাত খরচের জন্য সামান্য কিছু রেখে, মাইনের পুরো টাকাটাই অনুরাধা বাবার হাতে তুলে দেয়। খুব বেশী নয় অবশ্য তাও তো একটা সাহায্য। আয় বাড়াবার জন্য অনুরাধা দু-একটা প্রাইভেট টিউশানি করবে ঠিক করেছে।।

বছর ছয়েক আগে, বাবার অসুখের সময়ও ওরা সবাই এলাহাবাদে থাকতো। সেইসব দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে অনুরাধার। জীবনটা কি সরল ছিল তখন, বাড়িতে কোন অশান্তি ছিল না—টাকা পয়সা ইত্যাদি ছিল বড়দের জগতের ব্যাপার। আর এলাহাবাদ জায়গাটা কলকাতার থেকে এখনো অনেক ভালো লাগে অনুরাধার। শুধু এলাহাবাদের একটা ঘটনা তার বুকে শেল হয়ে বিঁধে আছে। একজন মানুষ, সে এখন বিলেত না জার্মানিতে, সে চিঠি লিখবে বলেছিল—

এখন অনুরাধা আয়নার সামনে, রাত্রিবেলা। বাড়ির আর সবাই শুয়ে পড়েছে। আগে অনুরাধা ভাইবোনের সঙ্গে এক ঘরে শুতো, এখন দাদা চলে যাবার পর সে সেই ঘরটা পেয়েছে। বাবা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েন, মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে আজ অনেক রাত করে ফেলেছে অনুরাধা। তারপর, তারপরও সে চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ বই পড়েছে—বই পড়া তার নেশা, রোজ রাত্তিরে একটু না পড়লে তার খাবার হজম হয় না।

ঘুম আসবার পর সে উঠে এসেছে আয়নার কাছে, চুল বাঁধছে। অনেকখানি লম্বা চুল তার, চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে যাচ্ছে তো আঁচড়েই যাচ্ছে। অন্যমনস্কতার লক্ষণ। খানিকটা বাদে টেনে চুল বেঁধে সে মুখে ক্রিম মাখতে লাগলো। গাল ও ঠোঁটের ওপর হাত সে কখনো আস্তে কখনো জোরে বুলোচ্ছে, অর্থাৎ অন্যমনস্ক। তারপর সে কানের পেছনে ও হাতের কনুইতেও ক্রিম লাগালো—এটা সে শিখেছে জয়শ্রীর কাছ থেকে—এতে কনুই দুটো খুব মসৃণ থাকে, ঘুচিমুচি হয় না। আয়নার ওপর কিসের যেন একটা দাগ পড়েছে, নখ দিয়ে ঘষে তুললো। এবার সে পোশাক পাল্টাবে। বুকের আঁচল ফেলে ব্লাউজের বোতাম···

না, দরজা-জানলা বন্ধ ঘরের মধ্যে অনুরাধার নিভৃত দৃশ্যে আমরা উঁকি মারবো না। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ভঙ্গির পরিমাপ নেবার কোনো আপাতত প্রয়োজন নেই ! কিন্তু তার হৃদয় গহনে কিসের আলোড়ন অর্থাৎ এই মুহূর্তে সে কি ভাবছে—আমরা অনায়াসেই তার সন্ধান নিতে পারি।

আয়নার সামনে নিজেকে দেখতে দেখতে অনুরাধা ভাবছে, এ পর্যন্ত কেউ কোনোদিন তাকে ভালোবাসার কথা বলেনি। তার বয়েস তেইশ বছর—এ পর্যন্ত কেউ না। তাদের বাড়ির একতলার ছেলেটি, দোতলার প্রণবেশদা, এলাহাবাদের সেই দুর্বোধ্য মানুষটি, আরো অনেকে, রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ, তার শরীরের দিকে তাকায়, তার শরীরের যে রূপ, তার প্রশংসা করেছে। ভালোবাসা ছাড়া রূপের স্তুতি এটা অত্যন্ত অপমানজনক লাগে অনুরাধার।

অনুরাধা নিজে ভালো করেই জানে—সে এমন কিছু রূপসী নয়। তার দাদার রং খুব ফর্সা হলেও—তার গায়ের রং অতটা ফর্সা নয়, জয়শ্রী অনেক ফর্সা। তার নাক চোখও নিখুঁত নয়, তবে তার স্বাস্থ্য ভালো, কখনো অসুখ করে না—অর্থাৎ কেউ যদি তাকে ভালোবাসে, তবে তার চোখেই অনুরাধাকে সুন্দর মনে হতে পারে। কেউ ভালোবাসার কথা বলেনি, সবাই শরীরের—। ভালোবাসা বলে কি সত্যিই কিছু আছে ? তার বিশ্বাস হয় না।

একমাত্র শান্তনু আর জয়শ্রীকেই সে শুধু দেখেছে পাগলের মতন ভালোবাসতে। অনুরাধা চায়, শান্তনু আর জয়শ্রীর ভালোবাসা সার্থক হোক, না হলে ভালোবাসার ওপর সত্যিই আর তার বিশ্বাস থাকবে না। ওরা দুজনে যেমন পরস্পরকে না দেখে ছটফট করে, সেটাই নিশ্চয়ই ভালোবাসা। ওদের দুজনকে খুব মানাবে, জয়শ্রীকে যেমন দারুণ দেখতে, তেমনি জেদী আর

অভিমানী—আর শান্তনু ভারী ভালো—পুরুষ মানুষকে যে রকম হলে মানায়। অনুরাধা ওদের সব রকম সাহায্য করবে।

অনুরাধার কাছে যেদিন প্রথম কোনো পুরুষ এসে বলবে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, অনুরাধা নিষ্ঠুরের মতন তাকে প্রত্যাখ্যান করবে।

॥ ৪ ॥

And all my fortunes at thy foot I'll lay
And follow thee, my lord, through out the world—

—শেক্সপীয়র

লাইট হাউস সিনেমার উল্টোদিকে আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছে শান্তনু, জয়শ্রীদের পাত্তা নেই। এইমাত্র শো আরম্ভ হয়ে গেল, সবাই ঢুকে পড়েছে ভেতরে—বাইরেটা প্রায় ফাঁকা। একটা বগরগে হলিউড-ছবি, বেশ ভিড়, কিছু লোক এখনো টিকিটের জন্য হা-পিত্যেশ করছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় আর কিছুই দেখা যায় না। সব কিছুই চোখের সামনে অথচ কিছুই চোখে পড়ে না। সেইজন্যই এতক্ষণ প্রত্যেকটা গাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখছিল শান্তনু, অথচ জয়শ্রীদের গাড়িটা দেখতে পায়নি। গাড়ি থেকে নেমে জয়শ্রী আর অনুরাধা যখন বেশ কয়েক পা এগিয়ে গেছে, সেই সময় দেখতে পেয়ে শান্তনু তাড়াতাড়ি ওদের দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ চোখ পড়ে গেল গাড়িটার দিকে। গাড়িতে বসে আছেন অলকা দেবী। এগিয়ে আসার বদলে শান্তনুকে থামের আড়ালে দাঁড়াতে হলো।

গাড়ির স্টার্ট বন্ধ, অলকা দেবী স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন। জয়শ্রী আর অনুরাধা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে যাবার পর তিনি ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করলেন। গাড়িটা নিউ মার্কেটের দিকে বেঁকে যাবার পর শান্তনু এগিয়ে এলো সিনেমা হলের দিকে। দরজা দিয়ে ঢুকে দেখলো জয়শ্রী আর অনুরাধা নেই। ওরা কি সিনেমা দেখতে চলে গেল নাকি? এর মানে কি? কোনো-রকম ইঙ্গিত বা চোখের ইসারাও করেনি—তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা সিনেমা দেখছে! অনুরাধা কি সেদিন ওর সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে নাকি?

হয়তো ওরা বাথরুমের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে, এই ভেবে একটু অপেক্ষা করলো শান্তনু। বাথরুম থেকে একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে বেরিয়ে গটগট

করে উঠে গেল ওপরে। শান্তনুর নিজেকে খুব বোকা বোকা লাগল। বাকি সব লোক সিনেমা দেখার প্রয়োজনে এখানে আসছে যাচ্ছে—সেই শুধু একা একা এখানে—অন্যরা কি তাকে লক্ষ্য করছে না? সেও যদি একটা টিকিট কিনে—কিন্তু আর টিকিট কাটার উপায় নেই, হাউসফুল, এ কথাটা তাব আগে মনে প'ড়েনি।

হল থেকে বেরিয়ে বাইরে বাস্তায় চলে এলো শান্তনু, মনটা তার বিস্বাদ লাগছে। ব্যাপারটা সে কিছুই বুঝতে পারছে না। সময় কাটাবার জন্য অন্য কোনো সিনেমা হলে ঢুকে পড়বে? এত কাছে, জয়শ্রী ঐ সিনেমা হলে বসে আছে, অথচ দেখা হবে না? অনুরাধা এটা কি ব্যবস্থা করলো? শো-ভাঙার পব দেখা করার চেষ্টা করে নিশ্চয়ই লাভ নেই। তখন অলকা দেবী আবার আসতে পারেন।

শান্তনু জায়গাটা ছেড়ে নডতে পারলো না, ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলো, অনবরত সিগারেট টেনে যাচ্ছে। মিনিট পনেবো বাদেই ইনটারভ্যাল, অনেক লোক বেরিয়ে এসেছে, জয়শ্রী আর অনুরাধাও খুঁজছে শান্তনুকে।

শান্তনুব হঠাৎ মনে হলো, সন্ধ্যে সওয়া ছ'টার সময় লাইট হাউসের সামনের রাস্তাটা একদম নির্জন, আর কোনো মানুষ নেই শুধু মেরুন ও লেবু রঙের শাড়ী পরা দুটি মেয়ে—তারা তার দিকে চেয়ে হাসছে। শান্তনু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, বাঃ, তোমরা হলের মধ্যে ঢুকে পড়লে যে? আমি ভাবলাম, তোমরা সত্যি সত্যি সিনেমা দেখবে

জয়শ্রী হেসে বললো, তুমি বুঝি চলে যাচ্ছিলে?

—আমি বুঝবো কি করে? অনুরাধা তো সিনেমা দেখাব কথা বলেনি?

অনুরাধা বললো, বাঃ, মাসীম'ব কাছে মিথ্যে কথা বলবো নাকি? মাসীমাকে বললাম সিনেমা দেখতে যাচ্ছি—একবাব অন্তত যদি ভেতরে না ঢুকি—তাবপর দেখতে যদি ভালো না লাগে সেটা আলাদা।

—আমাকে অন্তত সেটা একটু বোঝাব সুযোগ দেবে তো? তোমরা সোজা ভেতরে ঢুকে গেলে—

অনুরাধা উত্তর দিল, কেন, মনেব কথা বুঝতে পারেন না? জয়শ্রী তো মনে মনে বলেছিল, আপনাকে অপেক্ষা করতে—

—আমি অত মনের কথা বুঝতে পাবি না! যদি চলে যেতাম—

—আপনি আজ চলে গেলে জয়শ্রী আর কোনোদিনও আপনার সঙ্গে—

জয়শ্রী বললো, অনুরাধা, চল, অন্য কোথাও যাই। এখানে দাঁড়িয়ে কং বলার দরকার নেই—

সিনেমা হলের ভেতরে বেল বেজে উঠেছে, অনুরাধা বললো, ঠিক আছে, তোমরা যাও, আমি চললাম—

—এ কি, তুই কোথায় যাচ্ছিস ?

—আমি যাই, সিনেমাটা দেখি গিয়ে। আমি আর শুধু শুধু মিস করি কেন।

—যাঃ, তুই একা একা সিনেমা দেখবি নাকি ?

অনুরাধা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমি আর দোকা কোথায় পাচ্ছি বল। তোরা যা। ঠিক সাড়ে আটটার মধ্যে ফিরে আসিস কিন্তু !

শান্তনু বললো, সেটা হয় না। মেয়েদের একা একা সিনেমা দেখাটা কি রকম বিচ্ছিরি ! অনুরাধা, তুমিও এসো আমাদের সঙ্গে—

তীক্ষ্ণ ঝংকারময় শব্দে হেসে উঠে অনুরাধা শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললো, ইস. আসলে তো মোটেই সেটা ইচ্ছে নয় ! নেহাৎ বলতে হয় তাই—

জয়শ্রী লজ্জা পেয়ে বললো, এই না, মোটেই না ! অনুরাধাও আমাদের সঙ্গে যাবে।

শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, তোমাকে আসতেই হবে। আমাদের এমন কিছু গোপন কথা নেই, যা তোমার সামনে--

অনুরাধা চাপা হাসি ঠোঁটে রেখে বললো, টু ইজ কম্পানি থ্রি, ইজ ক্রাউড। আমি কেন শুধু শুধু ভিড় বাড়াবো। তার চেয়ে বাবা আপনারা যান না, ঘুরে আসুন, কানে কানে কি সব কথা থাকে না—সেইসব (ফের হাসি), আমি ততক্ষণ সিনেমাটা দেখে নিই। জয়শ্রীকে গল্পটা বলে দেবো—ওকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে—

জয়শ্রী বললো কেউ গল্প জিজ্ঞেস'করবে না। তুই চল তো—

জয়শ্রী ছাড়লো না কিছুতেই অনুরাধাকে। চৌরঙ্গির সামনে ওরা তিনজন এসে দাঁড়ালো এক মিনিট। জয়শ্রী জিজ্ঞেস করলো, এবার আমরা কোথায় যাবো ?

শান্তনু বললো, প্রথমে কোথাও চা খাবো। অনুরাধার সেদিনকার চা পাওনা আছে।

—আমি বিকেলে একবার মাত্র চা খাই। আজ খাওয়া হয়ে গেছে।

—আমার অনুরোধে আজ না হয় দুবার—

কাছাকাছি একটা দোকানে ওরা চা খেতে গেল। ওদের বারংবার আপত্তি সত্ত্বেও শান্তনু অর্ডার দিল এক রাশ খাবারের। সেইসব খাবারের অধিকাংশই অবশ্য পড়ে রইলো প্লেটে—আত্মাভিমানী মেয়েরা পুরুষের সামনে কক্ষনো বেশী বেশী খাবার খায় না, খিদে থাকলেও দু'এক টুকরো ভেঙে মুখে দেওয়াই

নিয়ম। আজ অবশ্য ওদের খিদে নেই, অলকা দেবী অনেক কিছু খাইয়েছেন।

দোকান থেকে বেরুবার পর কোথায় যাওয়া হবে—এই নিয়ে আর আলোচনা হলো না, এমনিই ওরা কথা বলতে বলতে রাস্তা পেরিয়ে চলে এলো ময়দানের দিকে। পাশাপাশি ওরা তিনজনে, আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশে। অন্ধকার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, চৌরঙ্গি আলো ঝলমল, ময়দানের পায়ে-চলা পথটি জ্যোৎস্না ও গাছের পাতার ছায়ায় আলো-আঁধারি। বড় বড় বেনট্রি গাছগুলো যেন মেঘ স্পর্শ করতে চায়। আকাশে ফ্লাড লাইটের মতন এমন একখানা জোরালো চাঁদ উঠেছে যে মাঝে মাঝে না তাকিয়ে পারা যায় না। ওরা অবশ্য চাঁদ নিয়ে কথা বলেনি একবারও। সময় নেই।

জয়শ্রী চাপা অথচ দৃঢ় গলায় বললো, মা যদি আজও আসতে না দিত, তাহলে আমি ঠিক জোর করে চলে আসতাম। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।

অনুরাধা বললো, যাঃ, 'ওরকম বলছিস কেন! মাসীমা তো কখনো সেরকম আপত্তি করেন না।

—আজ আর একটু হলে বেরুনো বন্ধ হয়ে যেত না?

শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, তাই নাকি? কেন? তোমার মা আঁচ পেয়েছিলেন যে তোমরা সিনেমায় না গিয়ে—

অনুরাধা হাসতে হাসতে বললো, তা নয়। আবার একটা অশুভ চিহ্ন দেখা দিল যে।

—আজ, আবার কি?

—আজ আমরা বেরুতে যাচ্ছি, বাড়ির সামনেই জয়শ্রীদের গাড়ির তলায় একটা বেড়াল চাপা পড়লো। সত্যি বাবা বেড়ালকে গাড়ি চাপা পড়তে আমি কখনো দেখিনি! ওরা এত চালাক—

জয়শ্রী বললো, বাচ্চা বেড়াল, ভাল করে চোখ ফোটেনি। কারা রাস্তায় ফেলে গেছে, এমনিতেই মরতো—

অনুরাধা বললো, তা হলেও বাড়ি থেকে বেরুবার সময় এরকম একটা ব্যাপার ঘটলে মনটা খারাপ হয়েই যায়। মাসীমার ঠিক দোষ দেওয়া যায় না।

—তুই-ও কুসংস্কারের ডিপো হচ্ছিস দেখছি।

শান্তনু বললো, ঠিক আছে, এসো আমরা সেই পরলোকগত বেড়াল ছানাটার জন্য এক মিনিট শোক পালন করি।

বেড়াল ছানাটার নীল জলের ফোঁটার মতন চোখ দুটির কথা অনুরাধার মনে পড়ে। সে ঠিক হাসতে পারে না। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শান্তনু অনুরাধার দিকে ফিরে বললো, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পৃথিবীতে রোজ লক্ষ লক্ষ জন্তু জানোয়ারকে প্রাণ দিতেই হয়—এটাই নিয়ম।

পরমুহূর্তে সে জয়শ্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, তোমার মা যদি তোমাকে আজও আসতে না দিতেন, তুমি কি করতে ?

জয়শ্রী বিনা দ্বিধায় বললো, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতাম না অবশ্য। তবে রাত্তিরবেলা দরজা খুলে পালিয়ে আসতাম।

কথাটা একটু নাটকীয় শোনালো, কিন্তু অনায়াসেই বোঝা যায়, সে সত্যি কথা বলছে। জয়শ্রী এরকম পারে।

—পালিয়ে কোথায় যেতে ?

—তোমার কাছে।

কখন জয়শ্রী আর শান্তনুর হাত পাশাপাশি এসে গেছে, জয়শ্রীর নরম হাত মুঠিতে নিয়ে নিয়েছে শান্তনু। একটু পিছিয়ে গেছে অনুরাধা। কথা বলতে বলতে ওরা একটা পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, দুটি ছেলে ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় চাপা হাসি ও শিস দিয়ে গেল, ওরা গ্রাহ্য করলো না। শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, যদি বলি আজ রাত্তিরেও তোমাকে আর বাড়ি ফিরতে হবে না, আমার সঙ্গে চলো, তাহলে ?

—ফিরবো না, যাবো তোমার সঙ্গে।

—এই জন্যই তো বলছি, রেজিস্ট্রিটা করে রাখতে—

জয়শ্রী মুখ ফিরিয়ে বললো, এ কি, অনুরাধা একা একা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? এই অনুরাধা, এদিকে আয়—

—তোরা কথা সেরে নে না বাবা !

—না, তুই এদিকে আয়—

অনুরাধা কাছে আসার পর শান্তনু বললো, আচ্ছা অনুরাধা, রেজিস্ট্রিটা করে রাখতে কোনো দোষ আছে ? তাহলে জয়শ্রী আজই আমার সঙ্গে চলে যেতে পারতো—

অনুরাধা ত্রস্তে বললো, আজ নয়—আজ ও আমার সঙ্গে বেরিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কি আমাকে বিপদে ফেলতে চান ? আমাকে পুলিশে ধরবে।

—জয়শ্রীর বয়েস বাইশ বছর, রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে পুলিশের সাধ্য নেই—

জয়শ্রী বাধা দিয়ে বললো, বাইশ নয়, তেইশ বছর—তা ছাড়া রেজিস্ট্রি

করাবার ওপরেই বা এত জোর দিচ্ছ কেন? আমি ওসব মানি না। ও তো কোনো একসময় করে নিলেই হয়—ছুজনের যদি মন ঠিক থাকে।

শান্তনু এতটা মানতে চায় না। ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, রেজিস্ট্রি না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমাদের স্বীকার করবে না। আমি কোনো অবৈধ ব্যাপারের মধ্যে যেতে চাই না। তোমাকে আমি বলছি শোনো, আমার তিন চারজন চেনা ছেলে—বাড়ি থেকে কি দারুণ আপত্তি ছিল—কিন্তু রেজিষ্ট্রি হবার ছু' তন মাস বাদেই সব তো মেনে নিলই, এখন কি দারুণ খাতির—

জয়শ্রী মুচকি হেসে বললো, তোমার অবশ্য আমাদের বাড়িতে খাতির পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আমার মা যদিও বা মেনে নেন, বাবা কোনোদিনই মানবেন না! বাবাকে আমি চিনি।

—তোমার মা-ই শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে—

—মা পারবে না—

এক মিনিট তিনজনেই চুপ করে রইল। দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে যুক্তি মাথা নিচু করে থাকে। কথা ঘুরিয়ে শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, তোমার কাকার সেই ক্যাণ্ডিডেটের খবর কি?

—কে?

—তোমার কাকার অফিসে কাজ করেন, সুগত রায়চৌধুরী, তোমাকে যাঁর দেখতে আসার কথা ছিল?

—তুমি তার কথা জানলে কি করে?

—কি করে যেন জেনে গেলাম!

জয়শ্রী হালকাভাবে হেসে বলল, তার দিক থেকে আর ভয় নেই। আমাকে তার পছন্দ হয়নি।

—পছন্দ হয়নি? যাঃ! লোকটিকে আমি এমন বেরসিক মনে করতে পারি না। তোমাকে তিনি দেখেছেন নাকি?

—কি জানি, দূর থেকে দেখেছেন কিনা! মোট কথা, হি ইজ নট ইণ্টারেস্টেড। কাকা অবশ্য তাকে মোটর গাড়ি, টালিগঞ্জের জমি এসবের লোভ দেখিয়েছিলেন—তাতেও ভুললো না।

—আশ্চর্য! ওরও নিশ্চয়ই তাহলে কারুর সঙ্গে প্রেম আছে।

অনুরাধা মন্তব্য করলো, আপনার নিশ্চয়ই এতে একটু মন খারাপ লাগছে। বেশ কারুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করতেন, খুব গর্ব হতো!

—মোটেই না! কোনো মেয়েকে নিয়ে ছুজন পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটা অত্যন্ত প্রিমিটিভ আর ভালগার। মেয়েটির নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের

যেন কোনো দামই নেই। তা ছাড়া একজন লড়াই করবে বাবা-মায়ের সাপোর্ট নিয়ে—

—তাহলেও আপনি জিততেন। দেখলেন তো, আপনার সঙ্গে স্থগত রায়চৌধুরী কনটেস্ট করতেই সাহস পেলেন না!

এই জায়গাটায় নারী সঙ্গলোভী পুরুষদের ভিড় বাড়ছে, এখানে আর দাঁড়ানো যায় না। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করলো, ঢুকলো এসে ভিক্টোরিয়া স্মরণ উদ্যানে। খালি বেঞ্চির সন্ধানে ঘুরলো কিছুক্ষণ, পাওয়াও গেল—কিন্তু ততক্ষণে জয়শ্রীর মত বদলে গেছে, সে বেঞ্চে বসবে না, ঘাসে বসবে। বড় দিঘিটার পাড়ে এসে ওরা বসতে গেল, শান্তনু বসে পড়েছে, জয়শ্রী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে?

—বাঃ, রুমাল পেতে দিতে হয় তাও জানো না?

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে শান্তনু পকেট থেকে দ্রুত রুমাল বার করে পেতে দিয়ে বললে, বসো! পরক্ষণেই অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে অনুরাধার দিকে তাকিয়ে বললো, আমার মোটে একটাই রুমাল!

অনুরাধা মুচকি হেসে বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে!

জয়শ্রী বললো, সঙ্গে দুজন মহিলা থাকলে—নিজের বান্ধবী ছাড়া অন্যজনকেই প্রথমে অফার করতে হয়! এই অনুরাধা তুই বোস—

—না।

—তোকে বসতেই হবে। কেন ও দুটো রুমাল আনেনি!

শান্তনু জয়শ্রীকে বললো, ঠিক আছে, তোমারটা আমাকে দাও, সেটা অনুরাধাকে পেতে দিচ্ছি।

অনুরাধা বললো, সে তো আমার কাছেও একটা আছে—

এইরূপ কিছুক্ষণ রুমাল পর্বের পর, ওরা তিনজনেই বসলো। জয়শ্রী আর শান্তনু মুখোমুখি, অনুরাধার মুখ জলের দিকে। শান্তনু সিগারেট ধরিয়ে নারী দুটিকেও সিগারেট অফার করলো, ওরা তাতে চমকিত বা কৌতুক বোধ করলো না, নিস্পৃহভাবে বললো, না, ইচ্ছে করছে না।

শান্তনু অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললো, তোমরা আজ দুজনেই খুব সাজগোজ করেছো তো? তোমাদের দু'জনকেই খুব মানিয়েছে, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

অনুরাধা তীক্ষ্ণভাবে হেসে বললো, তুই কি মুশকিল করলি বল তো জয়শ্রী! এখন ওকে সব কথাই মেপে মেপে বলতে হবে, যাতে দুজনকেই খুশী করা যায়।

অনুরাধার সখীও যোগ দিল হাসিতে। পৃথিবীর সবচেয়ে স্মার্ট ব্যক্তিটিও একা বাংলাদেশের দুটি মেয়ের সামনে সপ্রতিভ থাকতে পারবে না। শান্তনু

কিছুতেই কথা জমাতে পারছে না। পাশাপাশি বসে পড়ে আরও অসুবিধে হয়েছে, ঘুরে বেড়ানোর সময় তবু ভালো ছিল। উঠে পড়ার প্রস্তাব দিয়ে শান্তনু বললো, এখানে বসে কি হবে, একটু বাদেই তো বন্ধ হয়ে যাবে—চলো, বরং বাইরে গিয়ে ফুচকা খাওয়া যাক!

জয়শ্রী বললো, একটু পরে। ফেরার সময়। এখানে বসে থাকতে বেশ লাগছে।

অনুরাধা বললো, ঘড়ির দিকে খেয়াল থাকে যেন—ঠিক সাড়ে আটটার সময় লাইট হাউসের সামনে গাড়ি আসবে।

তিনজনে এক সঙ্গে ঘড়ি দেখলো। এখনো এক ঘণ্টার বেশী বাকি। জ্যোৎস্নায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধটি ধপধপ করছে—চূড়ার ওপরে কালো পরীটি যেন এক্ষুনি উড়ে যাবে। একটু দূরে রাণী ভিক্টোরিয়ার বিশাল মূর্তিটি এখান থেকে অপ্রাকৃত ভয়ংকর দেখায়। মুখোমুখি সাদা সিংহ দুটি যেন রোদ পোয়াচ্ছে। বাইরে অবাঙালী গলায় নানারকম কলরব।

অনুরাধা বললো, কি ব্যাপার, সবাই চুপচাপ! এত কথা ছিল, দেখা না হবার জন্য এত ছটফটানি—এখন কোনো কথাই নেই। বুঝেছি, আমার জন্যই অসুবিধে হচ্ছে—

—না, না! সত্যি অনুরাধা, এত কথা আছে যে, কোনটা দিয়ে শুরু করবো—

—দুম করে শুরু করে ফেলুন।

—কথা আসলে একটাই! আমি জয়শ্রীকে চাই। জয়শ্রীও যদি আমাকে চায়।

—এখনো যদি?

জয়শ্রী হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে বসে আছে। জমকালো শাড়ীতে, জ্যোৎস্নার নিচে তার বরতনুটি এখন খানিকটা অলৌকিক মনে হয়। তার ফর্সা নিটোল গালের পাশে খানিকটা চূর্ণ অলক, কানে দুটি মুক্তোর দুলের ঝিকিমিকি, নরম হাত ঘাস ছিঁড়ছে মাটি থেকে। সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শান্তনুর দিকে, চোখের দৃষ্টি খানিকটা ঘোর লাগা মানুষের মতন। এই ব্যক্তিত্বময় পুরুষটিকে বার-বার দেখেও তৃপ্তি হয় না। ওর ঐ চওড়া কাঁধ, জড়তাহীন কণ্ঠস্বর-চোখের দৃষ্টি ও ঠোঁটের ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, মানুষটা সৎ। এমন মানুষকে তার বাবা-মা পছন্দ করতে পারলো না! সামান্য কি জাতের তফাৎ আর কাক মরলো না বেড়াল মরলো এই নিয়ে দুশ্চিন্তা—কিচ্ছু ভালো লাগে না। এইজন্যই তো জয়শ্রীর ইচ্ছে হয়, সব কিছুর প্রতিবাদ করতে। রেজেষ্ট্রি তো করাই যাক

যে কোনোদিন, কিন্তু রেজিস্ট্রি না করেও শান্তনুর সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে রাজী আছে। সব্বাইকে বলবে, বেশ করেছি। তাদের যদি একটা সন্তান হয়, তাও বলবে, বেশ করেছি।

শান্তনু তখন অনুরাধাকে বলছে, তুমি ঠিকই বলেছিলে। ছেলেদের বেশী কিছু ত্যাগ করতে হয় না, মেয়েদেরই হয়। আমার দিক থেকে তো আপত্তি করার কেউ নেই, আমাকে কিছু ছাড়তেও হবে না—কিন্তু জয়শ্রীর কষ্ট হবে—। অথচ জানো, আমার অনেক কাজ বাকি আছে—আমি এখন কিছু করতে পারছি না-সব সময় মাথার মধ্যে এই কথাটা ঘোরে। আর বেশীদিন দেরী করলে—

অনুরাধা বললো, জয়শ্রীর বাবা-মা একদিন রাজী হবেনই। তুম কবে কিছু করার দরকার নেই। তার আগে আমি তো জয়শ্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমি ওকে আপনার হাতে সম্প্রদান করে দিলাম। আমার এই বন্ধুটি একটু বেশী অভিমানী, কিন্তু বড্ডো ভালো মেয়ে—একে আপনার হাতে দিলাম, দেখবেন এর যেন কোনো অযত্ন না হয়। সারাজীবন ওর ক্রীতদাস থাকবেন, বুঝলেন মশাই! দিন, এবার আপনার হাতটা দিন, এই জয়শ্রী, তোর হাতটা দে তো।

জয়শ্রী লাজুক হেসে বললো, থাক, তোকে আর বেশী বেশী করতে হবে না!

অনুরাধা শুনলো না, জোর করে জয়শ্রীর একটা হাত টেনে তার ওপর শান্তনুর হাত রাখলো। চোখ বুজে মন্ত্র পড়ার অনুকরণ করে বললো, এই তো সম্প্রদান হয়ে গেল। নিন, এবার আপনারা কথা বলুন।

অনুরাধা উঠে পড়তেই জয়শ্রী বললো, কোথায় যাচ্ছিস?

—ঐ কলাবতী ফুলগুলো কি সুন্দর, আমি একটু দেখে আসি! তোরা একটু কথা বল না—

কলাবতী ফলের ঝাড়ের পাশে অনুরাধা একটু দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে গেল চন্দ্রমল্লিকার বাগানের দিকে। ফুল ছিঁড়লো না, মন্থর পায়ে ঘুরতে লাগলো সেখানে।

শান্তনু বললো, অনুরাধা এখানে বসে থাকতে লজ্জা পাচ্ছিল!

উত্তর না দিয়ে হাসলো জয়শ্রী।

হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, এখন শান্তনু আলতো আঙুল বোলাচ্ছে জয়শ্রীর পায়ের পাতায়। স্যাণ্ডেল খুলে বসেছে জয়শ্রী, বললো, এই পায়ে হাত দিও না!

—কেন? লজ্জা করছে, না সুড়সুড়ি লাগছে?

—দুটোই।

—কি নরম আর ছোট্ট তোমার পা দুটো। মেয়েদের পা যে এত ছোট হয় জানতুম না। পুজো টুজোর সময় যে লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকা হয়, ঠিক এই সাইজের। বোধহয় তোমারই পায়ের মাপ নিয়ে—

—সব মেয়েরই পা এই রকম।

—মোটেই না। তোমার পায়ে পর্যন্ত একটুও ধুলো-ময়লা নেই। তুমি কি এই পৃথিবীর ধুলো-ময়লায় হাঁটো না।

জয়শ্রী চপল ভাবে বললো, না।

—তোমার সব কিছুই এত সুন্দর। দেখলে কি রকম যেন কষ্ট হয়—এই যে বসে থাকার ভঙ্গি, চিবুকের রেখা—

জয়শ্রী চুপ করে স্তুতি উপভোগ করতে লাগলো। একবার শুধু বললো, আমার কাছে তুমি অনেক বেশী সুন্দর!

শান্তনু দুষ্টুমীর ভঙ্গিতে বললো, ইচ্ছে করছে, তোমার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটায় কুট করে একটু কামড়ে দিই।

—এ মা, পায়ের আঙুলে কেন?

—কি জানি এমনিই ইচ্ছে করছে—

—যাঃ!

—দেখো, একদিন ঠিক তোমারই ঐ আঙুলটায় আমি চুমু খাবো।

—বাজে কথা বোলো না!

—মেয়েদের বাঁ পায়ের কি যেন একটা আলাদা ব্যাপার আছে। কালিদাসের শকুন্তলা একটা অশোক গাছে যেই বাঁ পা ছোঁয়ালো, অমনি ফুল ফুটে উঠলো। আরও অনেক সংস্কৃত কাব্যে মেয়েদের বাঁ পা নিয়ে—

—তুমি কি আজকাল সংস্কৃত কবিতাও পড়ছো নাকি?

—একটু আধটু! মন্দ লাগে না—

শান্তনু নিবিষ্ট মনে জয়শ্রীর পায়ের আঙুলটা নিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ এক ঝলক দমকা হাওয়া উঠলো। দুজনেই চমকে উঠলো। দুজনেই চমকে ঘড়ি দেখলো, পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। সেই রকমই তাকিয়ে রইলো কয়েক পলক।

তারপর যে কথাটা পৃথিবীতে কয়েক লক্ষ-অযুত-নিযুত-কোটি বার বলা হয়ে গেছে, যে কথা শান্তনুও আগে কয়েকবার জয়শ্রীকে বলেছে, সেই কথাটাই শান্তনু আবার বললো। জয়শ্রীর হাঁটুর ওপর হাত রেখে শান্তনু ফ্যাকাসে গলায় জিজ্ঞেস করলো, জয়শ্রী, তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাসো?

যারা আন্তরিক তারা কখনোই এ কথাটা দৃঢ় বিশ্বাসে বলতে পারে না।

?নিকটা দ্বিধায় তাদের গলা কেঁপে যাবেই। যে সত্যিকারের ভালোবাসে, সেও এক কথায় সহজে উত্তর দিতে পারে না।

জয়শ্রী শান্তভাবে বললো, কি মনে হয়?

আমি জানি। তবু এক এক সময় কি রকম ভয় হয়। তোমার বাবা-মা যদি শেষ পর্যন্ত রাজী না হন, তাহলেও সব ছেড়ে আসতে পারবে?

পারবো।

সব কিছু?

এবার জয়শ্রী দ্বিধাহীন গলায় বললো, সব। আমার কষ্ট হবে—আমি কিছুদিন হয়তো কাঁদবো, কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি, তুমি যেদিন আমাকে ডাকবে, আমি তক্ষুণি সব কিছু ছেড়ে চলে আসবো। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

চন্দ্রমল্লিকার বাগানের পাশে একা একা ঘুরতে ঘুরতে অনুরাধা একটু অন্য-মনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এসব জায়গায় মেয়েদের একা একা বেড়াতে নেই, পুরুষেরা সে স্বাধীনতা দেয়নি।

একজন লোক অনুরাধার গা ঘেঁষে চলে গেল। একটু দূরে গিয়েই লোকটা আবার ফিরে এসে আবার গায়ের কাছে এসে নিচু গলায় বললো, কি, হবে নাকি? যাবে?

অনুরাধা একটু ভয় পেলেও ব্যস্ত হলো না। ঠাণ্ডা কঠিন চোখ তুলে তাকালো। কাছেই আর একজন লোক—দুজন কঠোর চেহারার পুরুষ। ঐ কথাগুলোর মানে বোঝে অনুরাধা, ছ'বছর কলকাতায় থেকে কলকাতার ভাষা শিখবে না? এই শুভ্র জ্যোৎস্নাময় পুলকিত যামিনীতেও মানুষ কত কর্কশ হতে পারে। এই ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনী উদ্যানেও মানুষ কত হৃদয়হীন।

লোক দুটি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হায়েনার মতন হাসলো। তারপর অনুচ্চ স্বরে বললো, মালটা বেশ ভালো রে!

এ কথারও মানে বোঝে অনুরাধা। নিছক শরীরের লোভের ভাষা।

॥ ৫ ॥

'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'

বঙ্কিমচন্দ্র

শান্তনুকে এ পর্যন্ত আমরা দুবার দেখেছি, দুবারই অস্থির প্রেমিক হিসাবে। শুধু প্রেমিকের ভূমিকায় কোনো পুরুষকে পুরোপুরি চেনা যায় না। এবার ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দেখা যাক।

শান্তনু থাকে লোয়ার সার্কুলার রোডের কাছে একটা ছোট ফ্ল্যাটে। বাড়িটা খুব বড়, তবে শান্তনুর ফ্ল্যাটটা ছোট। একটা বড় ফ্ল্যাট দু'ভাগ করে শান্তনু একটা অংশ পেয়েছে। বাড়িটাতে বিভিন্ন জাতের সম্মেলন—অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, মুসলমান, পাঞ্জাবী, পার্শী—বাঙালী পরিবার মাত্র দুটি। এসব বাড়িতে সবাই নির্লিপ্ত, অন্যদের ব্যাপার নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

এই ফ্ল্যাটে শান্তনু সম্পূর্ণ একা, একাকীত্ব ভোগ করার জন্যই শান্তনু এখানে এসেছিল। একটি হিন্দুস্থানী ছেলে সকালবেলা তার ঘর ঝাঁট দিয়ে থালা-বাসন ধুয়ে খাবার জল তুলে দিয়ে যায়। কোনো কোনোদিন সকালে শান্তনু খুব আলস্য বোধ করলে সে চা জল খাবারও এনে দেয়। নইলে শান্তনু নিজেই নিজের জন্য ছোটখাটো খাবার তৈরী করে নেয়, অথবা হোটেলে খায়। তার ঘরে একটা হটপ্লেট আছে, চায়ের জল বা খাবার গরম করার কোন অসুবিধেই নেই, কোনো কোনোদিন সে ভাত ডাল-মাংস রান্নারও চেষ্টা করেছে শখ করে, ফল খুব ভালো হয়নি অবশ্য। তবে খিচুড়িটা তার হাতে মন্দ আসে না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা শান্তনু এই ঘরেই কাটায়।

হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, এ সংসারে শান্তনু একা, তার আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। তা সত্যি নয়। শান্তনুর তিন দাদা, দুই দিদি ও এক ছোট বোন—ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছেন। তাঁরা সবাই বিবাহিত, তাঁদের মধ্যে দুই দাদা ও এক দিদি কলকাতা শহরেই থাকেন, আলাদা আলাদা বাড়িতে। শান্তনুর বাবার নাম আমরা উল্লেখ করবো না, অনেকে হয়তো চিনতে পারবেন। দেশ বিভাগের আগে থেকেই শান্তনুর বাবা বাংলা দেশের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সব সমেত সাত বছর জেল খেটেছেন, তার বিনিময়ে দুবার মন্ত্রী হয়েছেন। একবার সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় পদত্যাগ করে কিছু লোকের হাততালি এবং দিন তিনেকের জন্য

জনগণের হৃদয় আলোড়িত করেছিলেন। পরে এক তদন্ত কমিশনের সদস্য হিসেবে সরকারের অনুকূলে মত প্রকাশ করায় জনগণের ধিক্কার ও সান্ত্বনা হিসেবে পশ্চিম জার্মানিতে ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সহনেতা হয়ে যান। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে হেরে গিয়েও ভগ্নমনোরথ হলেন না, অ্যাসেম্বলিতে বক্তৃতা করা ও শোনা তখন তাঁর নেশা হয়ে গেছে, অ্যাসেম্বলির বাইরে থেকে সাধারণ জীবন যাপন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিপুল উদ্যমে, দল বদলে; আবার একটি বাই-ইলেকশনে দাঁড়ালেন। জিতলেনও, কিন্তু তার সুফল ভোগ করতে পারলেন না—শপথ গ্রহণের আগের রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে হরলিকস-এর গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলেন. দম আটকে মারা গেলেন ভোর হবার আগেই।

বাবার যখন খুব রবরবা ছিল, সেই আমলে শান্তনুর দুই দাদা বেশ উঁচু গোছের চাকরি জোগাড় করে নেয়। বলাই বাহুল্য, বাবার সুপারিশে নয়, নিজেদের কৃতিত্বেই। এই দাদারা মাঝে মাঝে রাজনীতির মধ্যেও খেলাধুলো করেন। আর এক দাদা পুরোপুরি রাজনীতিতেই মেতে আছেন। শান্তনুর জামাইবাবুরাও চাকরি, ব্যবসা ও রাজনীতির ত্রিফলার জল পান করেন সকাল সন্ধ্যা। শান্তনুই একমাত্র এ ব্যাপারে কখনো মাথা ঘামায় নি।

ঐ পরিবারের ছেলে হয়েও শান্তনু কেন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েনি—তার বন্ধু-বান্ধবরা একথা জিজ্ঞেস করলে শান্তনু হাসতে হাসতে একটা গল্প বলে। গল্পটার সত্যি মিথ্যের দায় শান্তনুর একার। শান্তনু বন্ধুদের বলে, তোরা কৃষ্ণা হাতি সিং-এর নাম শুনেছিস? একটা চমৎকার বই আছে ওঁর লেখা। সে যাই হোক, কৃষ্ণা হাতি সিং হচ্ছেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর মেয়ে, বিজয়লক্ষ্মী ও জওহরলাল নেহরুর আপন বোন, ইন্দিরা গান্ধীর পিসী। এই কৃষ্ণা হাতি সিংকে একবার একজন কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি এমন পরিবারের মেয়ে হয়েও সক্রিয় রাজনীতিতে রইলেন না কেন? একবারও ইলেকশনে দাঁড়ালেন না—। এর উত্তরে কৃষ্ণা হাতি সিং নাকি বলেছিলেন, বদ্ধ পাগলের পরিবারেও তো দু'একজন সুস্থ লোক থাকে!

বাবা যখন মারা যান, তখন শান্তনুর বয়েস সতেরো বছর। তার মা এত ছেলেবেলায় মারা গেছেন যে, শান্তনুর সে কথা ভালো মনেই নেই। তার ছোট বোন গায়ত্রীর জন্মের একমাস বাদেই মা মারা যান—তখন শান্তনুর বয়েস সাড়ে চার। বাবা মারা যাবার পর দু'বছর শান্তনু দাদাদের সঙ্গে ছিল। তারপর তার মেজদা যখন অফিস থেকে নিউ আলিপুরে চমৎকার ফ্ল্যাট দিচ্ছে, শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কি—এই বলে সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন,

তখন থেকেই ভাঙন ধরলো। এক বছরের মধ্যেই তাদের পৈতৃক বাড়িটা বিক্রী করে দেওয়া হলো—সাত ভাইবোনের মধ্যে ভাগ হয়ে শান্তনুও সেই টাকার একটা অংশ পেয়েছে। বাবার অন্যান্য সম্পত্তির বাঁটোয়ারা নিয়ে দাদাদের মধ্যে হাসিমুখে গোপন কলহ এখনো চলে, শান্তনু তার খোঁজ রাখে না।

বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবার সময় তার সব দাদা ও দিদিরাই শান্তনুকে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য বলেছিলেন, কিন্তু শান্তনুর এম. এ. পরীক্ষার ফাইন্যাল বছর, তাই সে পড়াশুনোর সুবিধের অজুহাতে হোস্টেলে চলে যায়। পাস করার পর শান্তনু মাস ছয়েক এ-বাড়ি ও-বাড়ি কাটিয়ে কিছুদিন দেশভ্রমণ করে, চাকরি পেয়ে যাবার পর সে নিজে আলাদা ফ্ল্যাট নিল। বাবা বেঁচে থাকবার সময় তাদেব বাড়ি ভিড়ে ভর্তি থাকতো—রাতদিন বহু লোকের আনাগোনা—দু'বেলা কুড়ি-বাইশজন লোকের খাবাব তৈরী হতো। বাবার সঙ্গে দেখা হতো কদাচিৎ, দাদারা নিজেদের নিযে ব্যস্ত, দিদিরা পিকনিক, জলসা, মামারবাড়িতে বেড়াতে যাওয়া নিয়ে সবাই আলাদা আলাদা। তার ছোট বোন তো দিল্লীতেই থেকেছে বেশীর ভাগ সময়।

আজকাল রাজনীতির সঙ্গে সমাজ সেবাব কোনো সম্পর্ক নেই বলে সপরিবারে কোনো কিছুতে যোগ দেবার প্রশ্ন নেই। এখন নেতারা বক্তৃতা দেন, পার্টি সংগঠন করেন—তাঁদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করে ভালো ভালো স্কুল কলেজে—অধিকাংশই মিশনারি, তাঁদের বউদের কথা শোনাই যায় না। গান্ধী-চিত্তরঞ্জনের যুগ আর নেই যে, তাঁদের সঙ্গে আইন অমান্য করে বউ-ছেলেমেয়েরাও জেলে যাবে কিংবা একসঙ্গে বস্তী উন্নয়ন করবে। শান্তনুর বাবাও তার ভালো পড়াশুনোব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাংলা দেশের পারিবারিক জীবন বলতে যা বোঝায়, শান্তনু কখনো সেটা ঠিক পায়নি। ফলে, আলাদা হয়ে থাকায় তার খারাপ লাগেনি, অন্যরাও কিছু অস্বাভাবিক মনে করেনি।

বেশ কয়েক বছব আলাদা থাকবাব ফলে শান্তনুর বাবার সহকর্মী বা পরিচিত ব্যক্তিরা এখন তাকে ভুলে যেতে সমর্থ হয়েছে। এখন আর যে-কোনো জায়গায় হঠাৎ শুনতে হয় না, আরেঃ, তুমি অমুকের ছেলে না? ছেলেবেলায় তাদের বাড়িতে এসে যেসব তখন অখ্যাত কিন্তু এখন বিখ্যাত বা কুখ্যাত ব্যক্তিরা শান্তনুর মাথায় হাত দিয়ে আদর করতেন, এখন আর তাঁরা তাকে চিনতে পারেন না। এখন সে নিছক একজন শান্তনু সরকার। এখন তার চাকরি, তার বাড়ির ঠিকানা, তার নিজের পরিচয়টুকুই পৃথিবীতে একমাত্র পরিচয়। শান্তনু ভোট দেয় না।

শান্তনুর চরিত্রে একটা অস্থিরতা আছে। এ পর্যন্ত সে তিনটে চাকরি বদলেছে। পাস করবার কিছুদিন পরেই সে একটা কলেজের চাকরি পেয়ে যায়। কলেজে পড়ানোর ব্যাপারটা শান্তনুর ঠিক মনঃপূত নয়, কিন্তু চাকরিটা ছিল লীভ ভ্যাকান্সির, ছ' মাসের জন্য, সুতরাং খানিকটা কৌতুকবশেই কো-এডুকেশনাল কলেজের চাকরিটা নিয়ে নেয়। যে-কোনো কারণেই হোক কলেজ কর্তৃপক্ষের বেশ পছন্দ হয়ে গেল শান্তনুকে, ছ' মাস পরেও তাকে ছাড়ানো হলো না—সেখানেই রয়ে গেল। চার বছর বাদে হঠাৎ সে-চাকরিটা ছেড়ে দিল সে নিজেই। বন্ধু-বান্ধবরা জিজ্ঞেস করলে শান্তনু উত্তর দিয়েছিল, একঘেয়ে হয়ে গিয়েছিল, প্রত্যেক বছর একই জিনিস পড়ানো ·। আসল কারণ অবশ্য দু' একজন অনুমান করেছিল, সেই বছরই শান্তনু তার ক্লাসের ছাত্রী জয়শ্রীর প্রেমে পড়ে। এবং জয়শ্রী কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শান্তনুও চাকরি ছেড়ে দেয়।

তারপর মাস ছয়েকের জন্য সে রেডিওতে একটা কাজ কাজ পেয়েছিল। তখন বন্ধু-বান্ধবরা তাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করতো, কি রে, শান্তনু আজ আবহাওয়ার খবর কি ? যদিও শান্তনু রেডিওতে ঘোষকের চাকরি নেয়নি, তার গলা একবারও শোনা যায়নি বেতারে—কিন্তু বন্ধু-বান্ধবরা ঠাট্টা করতো, বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সাংকেতিক ভাষায় জয়শ্রীকে খবর পাঠাবার জন্যই শান্তনু ঐ চাকরিটা নেয়।

রেডিওর চাকরিটা আবার সে হঠাৎ কেন ছেড়ে দিল, তা ঠিক জানা যায় না। বন্ধুরা অবশ্য বলে, মাসের পর মাস এরকম ঝড়-বৃষ্টি চলছে, আবহাওয়া এত খারাপ বলেই শান্তনুর ঐ চাকরিতে মন বসলো না। এর পর কয়েক মাস সে বেকার ছিল, তাতে অবশ্য তাকে অর্থকষ্টে পড়তে হয়নি তেমন। বরং প্রণয়ের অনুপান হিসেবে যখন তখন একলা ঘরের বিছানায় শুয়ে শূন্য দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলার একটা সুযোগ পেয়েছিল। তবে, এই অবস্থা বেশীদিন থাকে নি, এক বন্ধুর যোগাযোগেই সে একটা বিদেশী জাহাজ কোম্পানির স্থানীয় অফিসে সহকারী ম্যানেজারের চাকরি পেয়েছে। চাকরিটার মাইনে ভালো—তার আগেকার চাকরিগুলোর চেয়ে অনেক বেশী—কিন্তু এ কাজটা নেবার জন্য তার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ, তার ধারণা, কোম্পানি হয়তো তাকে বছরে একবার বিদেশে ঘুরে আসার জন্য জাহাজী-পাস দেবে। (ভুল ধারণা।)

এই ডামাডোলের বাজারে শান্তনুর হুট হাট করে চাকরি ছেড়ে দেওয়া ও আবার পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে। কিন্তু শান্তনুর

কয়েকটি যোগ্যতা আছে। মিশনারি স্কুলে পড়ার ফলে সে অনর্গল কাজ চালানো ইংরেজী বলতে পারে, ইকনমিক্সে তার মোটামুটি একটা ভালো ডিগ্রি আছে, এবং তার চেহারাটা ভালো। চাকরির বাজারে এই তিনটি জিনিসের দাম এখনো কমেনি। তাছাড়া, সে পারিবারিক কোনো সুযোগ-সুবিধে না নিলেও, বরাবরই সে ভালো স্কুল-কলেজে পড়েছে, তার সহপাঠি বন্ধু-বান্ধবদের অনেক যোগাযোগ, তারা শান্তনুকে ছাড়ে নি।

শান্তনুর চেহারা ভালো, কিন্তু জয়শ্রী তাকে যত সুন্দর মনে করে, ততটা রূপবান সে নয়—পুরুষ মানুষের রূপ বলতে ঠিক কি বোঝায়, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভবও নয়। ফর্সা রঙের ওপর মেয়েদের একটা দুর্বলতা আছে, শান্তনুও বেশ ফর্সা, লম্বা-চওড়া, ঝরঝরে শরীর, তবে তার নাকটা একটু চাপা,ভুরু দুটো বেশ গভীর—কিন্তু চোখের মণি দুটো পুরোপুরি কালো নয়, একটু খয়েরি ভাব আছে, হঠাৎ দেখলে একটু চীনে বা জাপানী জাপানী ভাবে আসে। যখন সে প্রাণ খুলে হাসে, তখন মনে হয় একটা শিশু যেন দৈববলে আচমকা সাতাশ বছর বয়স্ক চেহারা পেয়ে গেছে।

আগেই বলেছি, শান্তনুর চরিত্রে একটা অস্থিরতা আছে। যে-কোনো সময় সে একা থাকলেই অনুভব করে, তাকে একটা কিছু করতে হবে—যে-ভাবে সে জীবন কাটাচ্ছে, এটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু এর বদলে কি, সেটা সে খুঁজে পায়নি। অনেক মানুষই সারা জীবন সেটা খুঁজে পায় না, অনেকে মধ্যপথেই অনুসন্ধান ছেড়ে দেয়, শান্তনু এখনো দেয়নি। তার কোনো সাংসারিক বন্ধন নেই, হা অন্ন যা অন্ন বলে ছোটাছুটি করার মতন অবস্থাও ঠিক তার নয়, ভদ্র গোছের চাকরি ও পরিচ্ছন্ন বাসভবন তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।—এই অবস্থায় মানুষ সেই বাসভবনকে আসবাব দিয়ে সাজায়, দেয়ালে ছবি টাঙায়, দরজার সামনে ওয়েল-কাম লেখা পাপোশ পাতে, কিন্তু শান্তনুর এতে তৃপ্তি নেই। সে অন্য কিছু চায়। শান্তনু অন্যান্য গুণের জন্য নয়, তার চরিত্রের এই দিকটির জন্যই তাকে আমরা এই কাহিনীর নায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছি।

মাঝখানে কিছুদিন সে ভেবেছিল, এখানকার ব্যাঙ্কের টাকাকড়ি সব তুলে নিয়ে বিলেতে চলে গিয়ে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়বে। চিঠিপত্রও লেখালেখি করেছিল, হঠাৎ তার উৎসাহ চলে গেল। সে অধ্যাপনা করতে চায় না, অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা করেই বা কি করবে? আবার ছাত্র হওয়ার ইচ্ছেও তার নেই। জাহাজে চাকরি নিয়ে জাহাজে চড়ে সাত সমুদ্দুরের বুকে ঘুরে বেড়াবে, এরকম একটা ছেলেমানুষী পরিকল্পনাও একবার তাকে পেয়ে বসেছিল।

এখন শান্তনুর সমস্ত অস্থিরতা জয়শ্রী সম্পর্কে। জয়শ্রীকে না পেলে সে আর অন্য কিছু ভাবতে পারবে না। এটা এখন তার এমন এক দুর্দান্ত নেশা, যার কোনে ব্যাখ্যা নেই।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। শান্তনু যে জয়শ্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার পরই প্রথম নারীর সংস্পর্শে এলো, তা নয়। তাদের বাড়িতে এক সময় বহু নারী পুরুষের আনাগোনা ছিল। কোনো কনফারেন্স উপলক্ষে তাদের বাড়িতে প্রায়ই পনেরো-কুড়িজন নারী-পুরুষ রাত্রে ঘুমোতো। এমনও কখনো কখনো হয়েছে, বাড়িতে অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য, এক ঘরে আটজন দশজন শুয়েছে, মেঝেতে ঢালাও বিছানা পেতে। ছেলেবেলায় তার ঘুমন্ত হাত ছুঁয়ে দিয়েছে পার্শ্ববর্তী নারীকে। এইসব পরিবেশে যে দু'একটা ধরাবাঁধা অসভ্যতা হয়, শান্তনুর সে-রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে কিছু কিছু।

অনেক সময়ই তাদের বাড়িতে প্রাইভেসি থাকতো না, কৈশোর ও প্রথম যৌবনে মেয়েদের শরীর সম্পর্কে জানার জন্য শান্তনুকে লুকিয়ে চুরিয়ে উঁকিঝুঁকি দিতে হয়নি। তার আঠারো বছর বয়েসে, তার থেকে অন্তত দশ বছরের বড় এক প্রখ্যাত সমাজসেবিকার ছোট বোন তাকে মাকড়সার জালে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল। সেই কাহিনীর রগরগে বর্ণনা দেবার ইচ্ছে আমার নেই, মোট কথা শান্তনু তার সুকৃতির ফলে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল সেই জাল ছিঁড়ে।

এইসব ঘটনা ছাড়াও, শান্তনু তার কলেজের বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যখন গেছে মিশেছে তাদের বোন বা আত্মীয়দের সঙ্গে, একসঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলেছে, পিকনিকে গিয়ে হেসেছে। অর্থাৎ কোনো মেয়ে এসে ভালোবাসার কথা জানালেই মাথা ঘুরে যাবার মতন অবস্থা তার নয়। ভালো চাকরি পেয়ে ঘর গুছিয়ে—এবার বেশ একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করতে হবে—এরকম চিন্তাও সে কখনো করেনি। তবু জয়শ্রী তার মাথা ঘুরিয়ে দিল। কখন যে কার মাথা ঘোরে সেইটাই তো রহস্য।

প্রথম আকর্ষণ দেখা গিয়েছিল জয়শ্রীর দিক থেকেই। মেয়েদের সঙ্গে অনেক পরিচয় সত্ত্বেও শান্তনু মেয়েদের সামনে সব সময়ই একটু লাজুক থাকে। কলেজে পড়াবার সময় সে তুখোড় অধ্যাপক ছিল না, ক্লাসে মুখ নিচু করে পড়াতো। বিশেষতঃ সামনের কয়েকটা বেঞ্চেই বসতো মেয়েরা, সুতরাং চোখ তুললেও তাকে তাকাতে হতো ক্লাসের শেষ দিকে, যেখানে প্রায় তারই সমবয়েসী ছাত্রদের জটলা।

তবু অবিবাহিতা সুদর্শন মাস্টার মশাইদের সম্পর্কে মেয়েদের একটা হীরো

ওয়ারশীপের ভাব থাকেই। স্মার্ট ছেলেদের চেয়েও লাজুক পুরুষই মেয়েদের মন কাড়ে বেশী। প্রত্যেক ইয়ারেরই বেশ কয়েকটি মেয়ে প্রেমে পড়ে যেত শান্তনুর। অনেক মেয়ে তাকে বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখতে চেয়েছে। এতে বিচলিত হয়নি শান্তনু, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হেসে হেসে সেই গল্প বলেছে, মেয়েদের চিঠি দেখিয়েছে। কোনো ছাত্রীরই সে প্রাইভেট টিউটর হয়নি। কারুকেই সে তার ফ্লাটে পড়া বুঝে নেবার জন্য আসতে বলেনি। জয়শ্রীও ছিল তার ক্লাসের অনেক মেয়ের মধ্যে একজন, ভালো করে কখনো তার দিকে চেয়ে দেখেনি শান্তনু।

দেখা হলো সিমলায়। শান্তনু সিমলায় তার বড়দির কাছে বেড়াতে গিয়েছিল। স্যাণ্ডাল পয়েন্টে একদিন একা দাঁড়িয়ে আছে, লাল শাড়ী ও লাল সোয়েটার পরা একটি মেয়ে তার সামনে এসে হাত জোড় করে বললো, স্যার, আমায় চিনতে পারছেন?

প্রথমটায় একটু বিরক্তই হয়েছিল শান্তনু। মনের ভাবটা ছিল এই রকম, এখানেও নিস্তার নেই? এখানেও ছাত্রছাত্রী?

কিন্তু মুখে মোলায়েম হাসি ফুটিয়ে বলল, হ্যাঁ, তুমি তো থার্ড ইয়ারের—

কলেজ থেকে হাজার দেড়েক মাইল দূরে দেখা বলেই হয়তো, ছাত্রী তার অধ্যাপকের সামনে তেমন সম্ভ্রম দেখায় না। খানিকটা কৌতুক হাস্যেই জয়শ্রী জিজ্ঞেস করেছিল, ঠিক চিনতে পারছেন? বলুন তো, আমার নাম কি?

থার্ড ইয়ারের ক্লাস মাত্র দু'তিন মাস ধরে নিচ্ছে শান্তনু, সব ছেলেমেয়েদের নাম এখনো মুখস্থ হয়নি। তবে, এই মেয়েটিকে মনে পড়ছে, ডান দিকের সামনের বেঞ্চে বসে, এ আর একটি মেয়ে প্রায়ই ফিসফিস করে কথা বলে। মাথার ভেতর তন্ন তন্ন করে খুঁজে শান্তনু বললো, হ্যাঁ, মনে আছে। তোমার নাম, অনুরাধা—

—না, হলো না। অনুরাধা তো আমার পাশে যে বসে—

—তাহলে তোমার নাম কি?

—আপনি মনে রাখেন নি তো—

জয়শ্রীর সঙ্গে তার ছোট ভাই। সে ভারী ছটফটে আর দুরন্ত, এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায় না। বেশীক্ষণ কথা হলো না, জয়শ্রী বললো, স্যার, আসুন না আমাদের বাড়িতে। কালীবাড়ির পাশেই—

শান্তনু খানিকটা দায়সারাভাবে বলেছিল, আচ্ছা, যাবো একদিন—

—আজই চলুন না।

—আজ নয়। আজ আমার একটা কাজ আছে।

—কি কাজ? অনেকক্ষণ ধরেই তো এখানে দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি। কেউ আসবে বুঝি?

ঘনিষ্ঠতা না থাকলে কেউ এরকম প্রশ্ন করে না। শান্তনু একটু অস্বস্তিবোধ করলো, ছাত্রীদের সঙ্গে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বললেই তার এরকম হয়। ছাত্রীরা তো আর মেয়ে নয়, তারা শুধু ছাত্রী, একটা অন্য শ্রেণী। একটু গম্ভীরভাবে বললো, হ্যাঁ একজন আসবার কথা আছে। আরেকদিন যাবো—।

জয়শ্রী তার বাড়ির ঠিকানা দিল, শান্তনুর বাড়ির নির্দেশ জেনে নিল, তারপর চলে গেল ভাইয়ের হাত ধরে। শান্তনু দাঁড়িয়েই রইলো। তাব আর কাজ কি—বিলীয়মান সন্ধ্যায় শুধু উপত্যকার দিকে তাকিয়ে থাকা। কারুর আসার কথা নেই।

পরদিন যাবে বলেছিল, কিন্তু ওটা কথার কথা, শান্তনু যায়নি জয়শ্রীদের বাড়িতে। তার পরদিন, শান্তনু লোয়ার বাজারে ঘুরছে, হঠাৎ বড় বড় শিলের টুকরো সমেত বৃষ্টি নামলো, ছুটে একটা দোকানের মধ্যে আশ্রয় নিতেই দেখলো জয়শ্রী আর তাদের বাড়ির অনেকেই সেখানে। জয়শ্রী তার মা অলকা দেবীকে টেনে এনে বললো, মা এই যে আমাদের মাস্টারমশাই, যাঁর কথা বলছিলাম। একদম কথা দিয়ে কথা রাখেন না—

অলকা দেবী বড় মধুর ব্যবহার করেছিলেন শান্তনুর সঙ্গে। তিনিই জোর করে শান্তনুকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন, জয়শ্রীর বাবা হৃষীকেশও আলাপ করেছিলেন অনেকক্ষণ। হৃষীকেশই জয়শ্রীকে বলেছিলেন, পুজোর পর মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলো, প্রণাম করেছিস? আমাদের সময়ে আমরা—। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার ব্যাপারে শান্তনুর বেশ আপত্তি, বাবার কথা শুনে জয়শ্রী প্রণাম করবেই—খানিকক্ষণ তাই নিয়ে বেশ হুড়োহুড়ি হলো। পরে অবশ্য, হৃষীকেশ যখন শুনলেন যে শান্তনুর পদবী সরকার—তিনি বেশ একটা সংশয়ের মধ্যে পড়ে গেলেন। শিক্ষক যদি অব্রাহ্মণ হয়, তবে ব্রাহ্মণ ছাত্রের কি তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা উচিত? যত যাই হোক, ব্রাহ্মণ হয়ে অব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিলে—

সিমলা ছোট জায়গা, ঘন ঘন দেখা হবেই। কখনো বাড়ির সকলের সঙ্গে কখনো ছোট ভাইয়ের হাত ধরে, কখনো একা জয়শ্রীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় শান্তনুর। কলেজ সংক্রান্ত কথাবার্তা ফুরিয়ে যাবার পর অন্য কথা আসে। জয়শ্রী মেয়েটি ভারী সরল, শান্তনু টের পায়, ওর কথার মধ্যে কোনরকম ঘোরপ্যাচ নেই। এই সুশ্রী মেয়েটির পরিস্ফুট ঝকঝকে শরীর ও ব্যবহারের মাদকতা শান্তনুকে স্পর্শ করে। শুধু এই মেয়েটি নয়, মাথার ওপরে একটা বিশাল

ঝকঝকে আকাশ, দূরে দূরে পাহাড়ের রেখা, বহুদূর থেকে আসা বাতাসের নরম স্পর্শ—এই বিশালত্বের অনুভূতির মধ্যে এই ফুরফুরে, ঝর্ণার জলের মতন স্বাদ কুমারীটিকে দারুণ মোহময় মনে হয়। শান্তনু তার বুকের মধ্যে একটা সুখানুভূতির ব্যথা অনুভব করে। মনে হয়, তার বুকের সামনে অনেকটা জায়গা বহুদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে, সেই শূন্যতার মাপ যেন ঠিক ঐ যুবতীর অঙ্গের আয়তনের সমান।

একদিন স্ক্যাণ্ডাল পয়েণ্ট থেকে রামধনু দেখা যাচ্ছে, সিমলার বিখ্যাত দৃশ্য, অনেক মানুষ এসে ভিড় করেছে। বাড়ীর লোকজনদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে জয়শ্রী চলে এল শান্তনুর কাছে। দু'চারটে কথার পর, রেলিং-এর ওপর নখ দিয়ে রেখা টানতে টানতে জয়শ্রী বলেছিল, সিমলায় আপনার সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা হলো, আপনি সেদিনও ঠিক এইখানটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনি সেদিন কার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন?

একটু হেসে শান্তনু উত্তর দিয়েছিল, এখন বুঝতে পারছি, তোমারই জন্যে।

তারপর আর শান্তনুর মুক্তি রইলো না। তারপর থেকে, জয়শ্রীদের ক্লাসে পড়াতে দারুণ কষ্ট হতো তার। জয়শ্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না, অথচ না তাকানোরও অসহ্য দুঃখ। কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে কোথাও জয়শ্রীর গলার আওয়াজ শুনলে কিংবা কেউ ঐ নাম ধরে ডাকলেই শান্তনু কেঁপে ওঠে। শান্তনুর মতন যুক্তিবাদী ছেলের যে কি করে এরকম অবস্থা হলো, তা কিছুতেই বোঝা যায় না।

জয়শ্রী কলেজ থেকে পাস করে যাবার পরই শান্তনুও সে কলেজ ছেড়ে দিল। জয়শ্রী ভর্তি হলো যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। শান্তনু সেখানে রোজ এমন ঘোরাঘুরি শুরু করলো যে ব্যাপারটা প্রায় দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়ালো। প্রথম প্রথম শান্তনুর সঙ্গে জয়শ্রীর দেখাশোনার কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু শান্তনুই এমন বাড়াবাড়ি করতে লাগলো যে নজরে পড়ে গেল অলকা দেবীর। সকালবেলা একবার ফোন করবে, কলেজে যাবার আগে একবার দেখা করবে, কলেজ থেকে ফেরার পরে। কোনো কোনদিন আবার জয়শ্রীকে বাড়ির কাছাকাছি ছেড়ে দিয়েই একটু বাদে শান্তনু আবার ফোন করেছে—জয়শ্রী ঠিক মতন বাড়ি পৌঁছেছে কিনা দেখার জন্য। এখন দেখাশুনোর বাধা সৃষ্টি হবার ফলেই সে আরও অশান্ত—অস্থির।

আমি একদিন শান্তনুকে বলেছিলাম, তুইও শেষকালে বিয়ে টিয়ে করে সংসারে জড়িয়ে পড়বি? বেশ তো ছিলি!

শান্তনু ফ্যাকাশে ভাবে হেসে বলেছিল, হ্যাঁ, বেশ ছিলাম।

রবিবারের সকাল, শান্তনু তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, ন'টা বেজে গেছে যদিও। চাকরকে দিয়ে চা আনিয়েছে, বেড সাইড টেবিলের ওপর চায়ের এঁটো কাপ, শান্তনু শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল। আমাকে দেখে বললো, চা খাবি ? দাঁড়া, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি !

আমি বললাম, থাক, তোকে আর উঠতে হবে না।

—তুই তাহলে ঐ কেটলিতে জল ভরে হট প্লেটে চাপিয়ে দে না ! আমি পরে বানিয়ে দেবো।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আমি বললাম, কি চমৎকার স্বাধীন জীবন তোর— কখন উঠতে হবে, কখন বেরুতে হবে—কিছু গরজ নেই, তাড়া দেবার কেউ নেই—। এই জীবন ছেড়ে, তুই-ও বিয়ে টিয়ে করে—

শান্তনু বললো, সবাই তো এক সময় তাই করে। তাছাড়া আর কি করে ?

আমি অন্যমনস্কভাবে বললাম, সবাই তাই করে হয়তো। কিন্তু আমরা তোর সম্পর্কে একটা অন্য কিছু আশা করেছিলাম।

—কেন, আমি কি দোষ করেছি ? শুধু আমার সম্পর্কেই অন্য রকম আশা করার কারণ কি ?

—তোর কতকগুলো সুবিধে আছে। তোর কোনো পারিবারিক দায় দায়িত্ব নেই। বাংলাদেশে শুধু এই একটা কারণেই তো কত ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বেঁটে হয়ে যায় ! টাকা পয়সার জন্য তোর খুব চিন্তা করার দরকার নেই। পড়াশুনোতেও তোর মাথা ভালো। আশা করেছিলাম তুই বড় কিছু একটা করবি ! দেশের জন্য—

—কি রকম বড় কিছু ?

—সেটা আমি কি জানি ! সেটা তোকেই ঠিক করতে হবে।

—আমার তো মনে হয়, মানুষ যেটা আন্তরিকভাবে চায়, সেটাতে সাকসেসফুল হওয়াই বড় কিছু করা। আমি চাই জয়শ্রীকে—

—অনেকেই তোর এই ব্যাপারটাকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলবে।

—তা বলুক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, ভূমিকম্পের সময় যদি কেউ ফাটল থেকে দূরে দৌড়ে যায় তাহলে কি তাকে এসকেপিজম বলা চলে ?

—সেটা তো প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তার সঙ্গে মানুষের জীবনের কোনো ব্যাপারের তুলনা হয় না। এটা স্রেফ তুলনার জন্য তুলনা—

—তোর সেই ফেভারিট কবির লাইনগুলো মনে নেই ?

"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ পৃথিবীতে আজ,
"যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ
চোখে ছাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—
প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের
সুপরামর্শ ছাড়া।"
—জীবনানন্দ দাশ

সত্যিই কি পৃথিবীর অবস্থাটা এখন এই রকম নয় ? এটা কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়ে কম ভয়ংকর ? এখন যাদের শরীরে নেহাৎ গণ্ডারের চামড়া নয়, মন টন বলে কোনো বস্তু আছে, তারা এখন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে ?

আমি হাসতে হাসতে বললাম, তুই যে প্রেমে পড়ার পর কবিতাও পড়তে শুরু করেছিস দেখছি !

—ছাটস রাইট ! প্রেমে পড়ার পর মানুষের অনেক সংগুণ জন্মায়। একজনকে ভালোবাসার পর মানুষ অনেক কিছু ভালোবাসতে শেখে। সারা পৃথিবীকেও তখন ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

একটুক্ষণ আমরা মুখোমুখি চুপ করে বসে রইলাম। নিঃশব্দে সিগারেট পুড়তে লাগলো। তারপর শান্তনু আমাকে ওর একটা অদ্ভুত দুঃখের কথা বললো। ব্যাপারটা ঠিক এদিক থেকে আমি ভেবে দেখিনি।

কেটলির জল ফুটে গিয়েছিল, জল উপচে হট প্লেটে পড়ে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হচ্ছিল, আমরা খেয়াল করিনি। খেয়াল হতেই শান্তনু তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে এসে সুইচ অফ করে দিল। কেটলিটা নামিয়ে তাতে চা ভিজিয়ে দেবার পর আমার দিকে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ মুখ ফিরিয়ে বললো, সুনীল, তোকে একটা কথা বলছি, জানি না, তুই বিশ্বাস করবি কি না। জয়শ্রীকে দেখার পর আমার খুব মায়ের কথা মনে পড়ে। আমার মনে হয়, জয়শ্রী আমার জীবনে আমার মায়ের অভাবটা পূর্ণ করবে।

—তার মানে ?

—বাড়ীর সবার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে আসার পর আমি সত্যিই একটা মুক্তির আনন্দ পেয়েছিলাম। যে যতই ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলুক, কিন্তু পারিবারিক জীবনে সেটা ঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু এই একা থাকার

স্বাধীনতাটাও এক এক সময় দারুণ বোঝা হয়ে ওঠে। তখনই সে একবার উঠে কখনো যে তুই বুঝবি? তুই সত্যি বিশ্বাস কর, জয়শ্রীর সঙ্গে পর থেকেই আমি আমার মায়ের অভাবটা খুব অনুভব করছি। ছেলেবেলায় আমার মা মারা গেছে, এতদিন ভালো করে মনে পড়ে নি

—সাইকলজির বই খুঁজলে এর নিশ্চয়ই একটা নাম পাওয়া যাবে

—ধ্যাৎ তেরি সাইকলজি! এটা আমার জীবনের দারুণ সত্যি ব্যাপার! একদিন বাদে মনে পড়ছে, আমার অসুখ হলে আমাকেই নিজে গিয়ে চিকিৎসা করাতে হয়, কেউ আমার কপালে হাত রেখে বলে না, এ কি, জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে! আমি কি খেতে ভালোবাসি, তাও আমাকে বলতে হবে নিজের মুখে—কখন আমার মন খারাপ হবে—কেউ টের পাবে না—এর দুঃখ বড় সাংঘাতিক।

কিন্তু নিজের মা ছাড়া, আর কোনো মেয়ে কি এই ভার নিতে পারে?

—নিশ্চয়ই পারে। ভালো করে ভেবে ত্যাখ, স্নেহ আর ভালোবাসার জাত প্রায় এক। দু'একটা উপসর্গ বাদ দিলে, একই তো, তাই না? তুই নিশ্চয়ই ভাবিস না যে আমি কোনো একটি মেয়ের শুধু রূপে মুগ্ধ হয়ে—

—রূপ বড্ড চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তখন আর বিচারবোধ থাকে না। এটা মানুষের একটা খুব স্বাভাবিক দুর্বলতা।

আমার সে দুর্বলতা নেই। রূপসী মেয়ে—আমি আগেও অনেক দেখেছি, জয়শ্রীর চেয়েও অনেক সুন্দরী মেয়ে—ওসব কিছু নয়, শুধু রূপ দেখে আমার মাথা ঘোরে না—

—জানিস তো, মানুষ যখন পাগল হয়, সে তখন নিজের পাগলামি টের পায় না।

—বাজে বকিস্ না! তুই আমার কাছে ভাংচি দিতে এসেছিলি কেন? আমি জানি, জয়শ্রী আমার জীবনের কতকগুলো অভাব মিটিয়ে দেবে, আমিও ওর জীবনের—। দুজন নারী-পুরুষ পরস্পরের ওপর নির্ভর করেও যে একটা অদ্ভুত আনন্দ পায়—

—ঠিক আছে, তুই যদি সেই আনন্দ পাস, তাহলে আমাদের তো ভালোই লাগবে! কবে বিয়েটা হচ্ছে?

—যে কোনো দিন।

॥ ৬ ॥

Ah ! Si Je Souffre, on Souffre aux cieux !

– M. D-Valmore

(আ ! আমি যদি দুঃখ পাই, স্বর্গে ওঁদেরও নিশ্চয়ই দুঃখ পেতে হবে !)

আমি এই পর্দাগুলো সব ফেলে দেবো !

শান্তনু কোনো কথা না বলে মৃদু হাসতে লাগলো।

পুরো এক সেট নতুন পর্দা কিনতে হবে। দেয়ালের ডিসটেমপারও পাল্টাতে হবে কিন্তু। আমার সাদা দেওয়ালই ভালো লাগে, নয়তো কোনো হালকা প্যাসটেল শেড – কি ক্যাটকেটে নীল রং তোমার দেয়ালের !

বাড়িটা তো আমার নয় !

না হলেই বা ! ভাড়া নেবার সময় ল্যাণ্ডলর্ডকে বলতে পারো নি ?

– আমি তো সাব-টেনাণ্ট ! ভাড়া বাড়িতে তো কখনো থাকোনি – তুমি জানবে কি করে ! ভাড়া বাড়িতে অত রকম আবদার চলে না !

ভাড়া বাড়িতেই বেশী চলে ! কে বলেছে ভাড়া বাড়িতে থাকি নি। আমাদের বাড়িটা তো কেনা হয়েছে মোটে ন'বছর। তার আগে আমরা ভবানীপুরে একটা বাড়িতে থাকতাম – অনুরাধারা এখন যেখানে থাকে, তার কাছেই, কি বিরাট বিরাট ঘর ছিল ! আহা, তুমিই বা ক'দ্দিন ভাড়া বাড়িতে আছে ?

আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমার পছন্দ মতন একটা সুন্দর ফ্ল্যাট ভাড়া নেবো। এ বাড়িতে তো আর থাকবো না।

জয়শ্রী ফুরফুরে প্রজাপতির মতন সারা ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এবার বিছানার ওপর বসে পড়ে বললো, রবিবারের কাগজ আছে ? দাও, বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনগুলো দেখি !

শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, এক্ষুণি দেখতে হবে ?

– তার মানে ? তোমার ইচ্ছেটা কি ? তোমার ইচ্ছে বুঝি আমি একেবারে বুড়ি হয়ে যাবার পর আমাকে বিয়ে করা ?

শান্তনু হাসতে লাগলো।

সকালবেলা শান্তনু তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, দরজায় খটখট শব্দ। শান্তনু চোখ বুজেই বলেছিল, ভেতরে এসো, খোলা আছে ! ক'দিন ধরে কলিং বেলটা খারাপ হয়ে আছে, হিন্দুস্থানী চাকরটা ভোরবেলা এসে ডাকাডাকি-

করলেও শান্তনু সহজে শুনতে পায় না—তাই ঘুম ভাঙলেই সে একবার উঠে দরজার ছিটকিনি খুলে রেখে এসে আবার শুয়ে পড়ে।

শান্তনুর ফ্ল্যাটে দুটো ঘর। একটাই বেশ বড় ঘরকে দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে, সামনের দিকটা বসবার, পেছনে শান্তনু শোয়। জয়শ্রী এসে একটানে তার গা থেকে চাদরটা তুলে নিতেই শান্তনু রীতিমতন চমকে উঠেছিল। প্রথমটায় বিশ্বাসই করতে পারে নি!

জয়শ্রী কোনোদিন তার বাড়িতে আগে আসেনি, আজ এত সকালবেলা, সম্পূর্ণ সাজগোজ করে!

শান্তনু তাড়াতাড়ি উঠে আলনা থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে গলিয়ে নিল। জয়শ্রী বললো, তুমি কি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করছো নাকি? আমাকে দেখে জামা পরলে যে?

-কি ব্যাপার? হঠাৎ এখন কি করে এলে?

–এমনি চলে এলাম। আজ থেকে এখানেই থাকবো।

কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো।

কিচ্ছু হয়নি? এমনি এলাম।

-এত সকালবেলা?

-আমি এসেছি বলে তুমি খুশী হওনি মনে হচ্ছে? ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি।

–আরে, দাঁড়াও, দাঁড়াও।

তখন শান্তনুকে দৌড়ে গিয়ে জয়শ্রীর পথরোধ করতে হয়। জয়শ্রী সোজা বেরিয়েই যাচ্ছিল। শান্তনুর চোখ থেকে ভালো করে ঘুম কাটেনি। জয়শ্রীর হাত ধরে এনে চেয়ারে বসালো, ওর হ্যাণ্ডব্যাগটা রেখে দিল দূরে। তারপর বললো, খুশী হওয়া না-হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না। আমার এখনো কি রকম অবিশ্বাস্য লাগছে। ঘুম থেকে প্রথম চোখ মেলেই তোমাকে দেখবো—তুমি সত্যি সত্যি এসেছো তো। নাকি স্বপ্ন কিংবা মায়া—

–কিংবা মতিভ্রম! আমার গা ছুঁয়ে দেখো, সত্যি কিনা।

একটা হালকা গোলাপী রঙের শাড়ী পরে আছে জয়শ্রী, সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের ভেতরের রঙটুকুর মতন। সকালের আলোর সঙ্গে এই রং মানায়। চুল বাঁধেনি, খোলা চুল পিঠময় ছড়ানো। এত সকালবেলাই স্নান করে বেরিয়েছে জয়শ্রী, ভেজাচুলের একটা চিক্কন আভা। তার ভুরু দুটোও ভেজাভেজা।

জয়শ্রীর একটা হাত টেবিলের ওপর রাখা, শান্তনুর খুব কাছেই। জয়শ্রী হাতটা আরও বাড়িয়ে কৌতুকের সঙ্গে বললো, ছাখো, ছুঁয়ে ছাখো!

সেই হাতখানির নগ্ন সৌন্দর্য শান্তনুব চোখ টেনে নেয়। স্লিভলেস ব্লাউজ, নরম সুডোল বাহুতে আর কোনো আভরণ নেই, শুধু একটা বালা। আঙুলের নোখগুলোতে স্বাভাবিক লালচে ভাব, মধ্যমায় একটি আংটি, জলের ফেনার মতন সাদা রঙের পাথর বসানো। জয়শ্রীর আঙ্গুলগুলোকে চম্পক অঙ্গুলি বললে খুব একটা অত্যুক্তি হয় না।

শান্তনু আস্তে আস্তে জয়শ্রীর হাতে হাত বুলোতে লাগলো। শান্তনুব উষ্ণ হাতে মনে হলো, জয়শ্রীর হাতখানা কি ঠাণ্ডা, মাখনের মতন মোলায়েম। ঐ ছোট্ট নরম হাতের মুঠোয় কত শান্তি লুকানো আছে। ফিসফিস করে বললো, বিশ্বাস হয় না, ছুঁয়ে দেখলেও বিশ্বাস হয় না!

পরক্ষণেই শান্তনু নিজেব হাতটা চকিতে তুলে নিয়ে বললো, আমাব চাকরটা এক্ষুনি আসবে। তোমাকে দেখলে কি ভাববে বলো তো?

কি ভাববে?

প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে পারবে না। তারপর ভাববে, তুমি বোধহয়, ইয়ে, সারা রাত ধরেই এখানে আছো।

জয়শ্রী নিস্পৃহ গলায় বললো, ভাবুক।

তোমার সাহস আছে কিন্তু। এরকম ভাবে চলে আসা—অন্য কোনো মেয়ে পারবে না। এ-বাড়িব সব লোক আমাকে অন্য রকম জানে- অথচ আমারই ঘরের মধ্যে সকালবেলা একটি জলজ্যান্ত সুন্দরী মেয়ে—

জয়শ্রী তীক্ষ্ণ চোখে শান্তনুব দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি না বলেছিলে এ বাড়িব কেউ কারুব সম্পর্কে মাথা ঘামায় না। এখন তুমিই তোমার সুনাম নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছো মনে হচ্ছে?

—না ঠিক তা নয়!

-তবে আবার কি। আমি এসেছি বলে সত্যি তুমি খুশী হওনি, না?

শান্তনু এবার উঠে এসে জয়শ্রীর ক্রুদ্ধ চিবুকে হাত রেখে নরম গলায় বললো, খুশীর চেয়েও অবাক হয়েছি বেশি, এ কথা সত্যি। আসল কথা কি জানো, তোমাকে আমি চাই, ভীষণভাবে চাই—কিন্তু লুকিয়ে-চুরিয়ে গোপনে কিছু পেতে আমার ইচ্ছে করে না। ছেলেমানুষের মতন মা-বাবাকে লুকিয়ে, প্রতিবেশীদের চোখ আড়াল করে, গোপনে একটা ঘরের মধ্যে দেখা করে- এর মধ্যে একটা কি রকম যেন পাপ পাপ ব্যাপার আছে। এটা আমার ভালো লাগে না। আমি চাই সোজাসুজি—

- তুমি খুব পিউরিট্যান তো! লুকিয়ে চুরিয়ে আবার কি? আমরা তো ছেলেমানুষ নই, আমাদের নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে বলে একটা ব্যাপার আছে।

শান্তনু জয়শ্রীর কাঁধের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়ালো। শিশুকে বোঝাবার ভঙ্গিতে খানিকটা স্নেহের সঙ্গে বললো, যাক গে, সত্যি করে বলো তো, বাড়িতে ঝোকের মাথায় কিছু করে আসোনি তো ?

যদি করেই থাকি, তাতে কি হবে ?

কিছু না। সব দায়িত্ব আমার। কিন্তু কি করেছো ?

কিছু না। এমনি চলে এলাম।

আসতে দিল ?

কাকুকে বলিই নি। ক'দিন ধরেই রাত্তিরে আমার ভালো ঘুম হচ্ছে না, শেষ রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে যায়, আর শুয়ে শুয়ে । আজ আর ভালো লাগলো না, উঠে চান করে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঝিকে শুধু বলে এসেছি, আমি একটু বেরুচ্ছি।

তোমার খোঁজ করবেন না ?

করবে নিশ্চয়ই। করুক না।

জয়শ্রী আপনমনে ঝঙ্কার দিয়ে হেসে উঠে আবার বললো, বেশ ভালোই তো হবে বাবা, মা কাকা কাকীমা ব্যস্ত হয়ে খোঁজাখুঁজি করবেন, চতুর্দিকে টেলিফোন, থানা, পুলিস হাসপাতালও হতে পারে আর আমি তার একটু-বাদেই হাসতে হাসতে অক্ষত শরীরে বাড়ি ফিরে যাবো। জিজ্ঞেস করলে শুধু বলবো, একটু বেড়িয়ে এলাম। মাঝে মাঝে এরকম করা ভালো, বুঝলে ? বোঝানো দরকার যে, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটা দাম আছে, আমি ভালো মন্দ বুঝি, নিজেকে সামলাতে পারি—

শীতের মধ্যে গায়ের চাদরটা খুলে ফেলার মতন ভঙ্গিতে লঘু গলায় শান্তনু বললো, ঠিক আছে, আজ আর তাহলে তোমার ফেরাই হবে না। আজ তোমাকে সারাদিন ধরে রাখবো।

—তোমার অফিস ?

—চুলোয় যাক অফিস। এসো, আগে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেওয়া যাক। আমার কাছে ডিম, স্যালামি আর পাউরুটি আছে। তুমি চা বানাতে পারো তো ?

—উঁহুঃ। কি করে বানাতে হয় ? আগে শিল নোড়ায় বেটে নিতে হয় বুঝি চায়ের পাতা ?

দুই যুবক-যুবতীর কৌতুক হাস্যে ঘরের বাতাস হয়ে গেল। জানলা দিয়ে দিয়ে নতুন হাওয়া এসে ঢুকলো। ওদের দেখতে চাকরটা এর মধ্যে এসে বোবা-চোখে ঝাঁট-পাট দিয়ে গেল ঘর। বিছানা তুলে, ক্ষিপ্র হাতে দু'একটা

জিনিস গুছিয়ে ঘরের চেহারাটাই পাল্টে দিল জয়শ্রী। এখন সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ডিম ভাজা বানাচ্ছে, কেটলিতে ভিজছে চা।

শান্তনু বললো, আজ সারাদিন আমরা এ ঘর থেকে বেরুবো না! শুধু গল্প করবো। দুপুরে যদি খিদে পায় তো—

জয়শ্রী ঘাড় ফিরিয়ে বললো, অনুরাধা আসবে একটু পরে।

অনুরাধা? কখন আসবে?

—ওর সঙ্গেই তো এলাম। ও কলেজে চলে গেল—ওর আজ মোটে দুটো ক্লাস নিতে হবে, ন'টার মধ্যেই ফিরে আসবে।

এক মুহূর্ত থেমে শান্তনু বললো, বাঃ, ভালোই তো। তিনজনে মিলে বেশ আড্ডা দেওয়া যাবে।

চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই ওরা এত ঘরোয়া হয়ে গেল যে শান্তনু মুখটুখ ধুয়ে এসে রীতিমতন অনুযোগের সুরে বললো, কই, এখনো চা হলোনা? এত দেরী?

জয়শ্রী গম্ভীরভাবে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত ছটফট করো না, রুটিগুলো সেঁকে নিই।

- আচ্ছা, চা থাক। জয়শ্রী, একটা কথা বলবো?

—কি?

—ভয়ে বলবো না নির্ভয়ে?

—ভয়ে ভয়ে।

—একটু কাছে আসবে একবার? চায়ের আগে আর একটা জিনিস খেতে ইচ্ছে করছে।

জয়শ্রী ভ্রূভঙ্গি করে বললো, না!

হতাশ প্রেমিকের মতন ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়লা শান্তনু। পরক্ষণেই একটা সিগারেট ধরিয়ে, পাশ ফিরে, কনুই পেতে হাতের ওপর মাথা রেখে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো জয়শ্রীর ব্যস্ত ভঙ্গিমা।

শান্তনু আস্তে আস্তে বললো, দু'দিন ধরে মেজাজটা বড় খারাপ হয়েছিল। আজ এত ভালো লাগছে—এতটা সৌভাগ্য যেন আমার সহ্য হবে না। জয়শ্রী, কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে তোমাকে—এই ঘরের সব কিছুর সঙ্গে তুমি এমন মানিয়ে গেছো—

মোটেই না, ঐ বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি পর্দা—

টেবিলে চায়ের কাপ ও খাবার, বিছানার ওপর বাবু হয়ে বসেছে শান্তনু। চেয়ারে জয়শ্রী। হঠাৎ মনে হবে, কোনো নবীন দম্পতির প্রতি সকালের দৃশ্য।

অথচ, জয়শ্রী এ-ঘরে আজ প্রথম এসেছে। বস্তুতঃ জয়শ্রী নিজে থেকে না এলে শান্তনু কোনোদিন তাকে আসতে বলতে পারতো না।

শান্তনু এখন দাড়ি কামাচ্ছে, জয়শ্রী তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। প্রতিদিনকার একঘেয়ে কাজগুলোও আজ কত রমণীয়। শরীরটা হালকা লাগছে শান্তনুর, জর জর ভাবটা আর নেই মনের মধ্যে, একটা চঞ্চলতা। আজ শান্তনু আয়নার দিকে তাকিয়ে ইচ্ছে করে বেশী ভেংচি কাটছে, চোখ টিপছে, ঠোঁট ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুখের ভেতরে—যেন দাড়ি কামানোটা একটা দারুণ কসরতের ব্যাপার। আয়নায় তার মুখের পাশে জয়শ্রীর মুখ—অন্যদিন সারা ঘর জোড়া শূন্যতা থাকে। তার অনেক দিনের শূন্যতার মধ্যে যেন একটা বীণা বাজছে। এই অপরূপা নারীটা আমার—আমি একে যেমন চাই, এ-ও আমাকে সেই রকম চায়। এই বোধটি যেন বুকের মধ্যে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয়। কোন মানুষ কতদিন বাঁচবে, তার কোনো ঠিক নেই, কত রকম বিপদ, কত দুর্ঘটনা—কিন্তু তার মধ্যেও যে মানুষ এই বোধের স্বাদ পেল না—তার মতন নিঃস্ব, তার মতন দুঃখী আর কে? এখন পৃথিবীতে শান্তনুর চেয়ে বেশী সুখী কেউ নয়।

জয়শ্রী আলতোভাবে শান্তনুর পিঠে তার গালটা ছোঁয়ালো। হাতের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল শান্তনুর, তার সমস্ত মনোযোগ তার পিঠের ঐ জায়গা টুকুতে। ঝনঝন করে কোথাও যেন শিকল ভাঙার শব্দ হচ্ছে। আর পারছে না, শান্তনু ঘুরে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল জয়শ্রী, দূর থেকে বললো, এই, দাড়ি কামানো শেষ করো!

চারটি চোখ নিথরভাবে থেমে রইলো, বেশ কয়েক পলক! তারপর শান্তনু বললো, আচ্ছা, আমি শেষ করছি, তুমি কাছে এসে দাঁড়াও।

দ্বিতীয়বার গালে সাবান লাগাবার সময় জয়শ্রী বললো, দাও, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। শান্তনু মুখটা এগিয়ে দিল, দেয়াল রং করার মতন ভঙ্গিতে বুরুশটা বোলাতে লাগলো জয়শ্রী। এ যে কি মায়ার খেলা, এতে যে কি সুরম্য উপভোগ, তা শুধু ওরাই বলতে পারবে। কৌতুকছলে শান্তনুর ঠোঁট ও নাকের ওপরেও সাবধান তো বুলিয়ে দেবেই জয়শ্রী। শান্তনু আরে আরে করে উঠতেই বাইরের দরজায় শব্দ হলো।

জয়শ্রী বললো, ঐ বোধহয় অনুরাধা এসেছে।

—দাঁড়াও, যদি অনুরাধা না হয়ে অন্য কেউ হয়। আমি দেখছি।

তোয়ালে দিয়ে মুখের সাবান মুছে শান্তনু এগিয়ে গেল দরজার কাছে। আর কেউ নয়, অনুরাধাই।

শান্তনু বললো, এই যে, এসো। তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। তোমার জন্য আমাদের আর একবার চা খাওয়া হচ্ছিল না।

ভুরুতে হাসি এঁটে অনুরাধা বললো, সত্যি ?

জয়শ্রী বললো, তুই ন'টার মধ্যে আসবি বলেছিলি, এখন ক'টা বাজে ?

সাড়ে ন'টা ! স্থাখ না, বাসের যা গণ্ডগোল, আসতেই পারছিলুম না। -ত দূরের রাস্তা।

জয়শ্রী, তুই এখন বাড়ি যাবি তো।

—বাড়ি যাবো না তো কোথায় যাবো ?

শান্তনু বললো, দাঁড়াও দাঁড়াও, এসেই যে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলে! বসো আগে। জয়শ্রী আজ যাবে না, ও আজ সারাদিন এখানেই থাকবে বলেছে।

বাঃ, ভালো কথা. থাকুক না।

তুমিও থাকবে ?

—আমি ? আমি নয়। আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। মায়ের শরীর ভালো না, আমি আজ রান্নাবান্না করবো।

জয়শ্রী বললো, বোস, একটু বাদে আমিও যাবো তোর সঙ্গে। ও অফিস যাবার পথে আমাদের নামিয়ে দেবে।

হতাশ ভঙ্গিতে শান্তনু বললো, তাহলে আমাদের সারাদিনের প্রোগ্রামটা আজ আর হলো না ?

—আর একদিন হবে, এখনো অনেক দিন পড়ে আছে। তুমি নতুন ফ্ল্যাট খোঁজো। এই ফ্ল্যাটটা আমার পছন্দ নয়।

—কাল থেকেই—

হ্যাণ্ডব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে অনুরাধা বললো, হ্যাঁ, আপনাদের এই বাড়িটা কি রকম যেন ? আমি যখন ঢুকেছি, বাইরে গেটের কাছে একটা লোক কি রকম অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, কে বলো তো ?

—কি জানি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বোধহয়। এমনভাবে তাকিয়ে আছে, যেন কিছু বলবে। কিন্তু কিছুই বললো না।

—ও, বুঝেছি। ও একটা বুড়ো ইহুদি।

—খুব বুড়ো তো নয়।

—মাঝ বয়েসী। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। ওর নাম লকহার্ট।

—কি নাম ?

—লকহার্ট। বেশ ভালোমানুষ!

—তা ও ওরকম বিশ্রীভাবে তাকায় কেন?

—ও কিছু নয়। ওর চোখের অসুখ আছে। দু'বার অপারেশন করেছে, তাও সারেনি। ওকে কে বলেছে, সকালবেলা সবুজ জিনিসের দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ভালো থাকে। তাই ও রোজ ভোরে উঠে, আমাদের গেটের সামনে যে দেবদারু গাছটা আছে, সেটার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকে। তুমিও সবুজ শাড়ী পরেছো তো, সেইজন্যই, কিংবা তোমাকেও ভেবেছে কোনো চলমান গাছ, কিংবা এক গুচ্ছ মাধবীলতা—

—ধ্যাৎ, যত সব বানিয়ে বানিয়ে—

আবার দাড়ি কামানো সেরে নিয়ে শান্তনু চুল আঁচড়াচ্ছে, জয়শ্রী চা বানাচ্ছে আবার। অনুরাধা শান্তনুর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার মুখ চোখ এত শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

—কই না তো!

—হ্যাঁ, কি রকম যেন দেখাচ্ছে!

—ও কিছু না, পরশু থেকে আমার একটু জ্বর জ্বর হয়েছিল।

জয়শ্রী উৎকণ্ঠিতভাবে মুখ ফিরিয়ে বললো, তোমার জ্বর হয়েছিল নাকি? এতক্ষণ বলোনি তো?

—এমন কিছু নয়, সামান্যই।

—দেখি, এখন জ্বর আছে নাকি?

বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এসে জয়শ্রী হাত রাখলো শান্তনুর কপালে। শান্তনু একটু আড়ষ্টভাবে তাকালো অনুরাধার দিকে।

অনুরাধার দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো, মাটির দিকে চেয়ে আছে। খেলাচ্ছলে পা থেকে একবার চটিটা খুলছে আবার পরছে। অনুরাধার ঠোঁটে অকারণ চাপা হাসি। সেদিকে তাকিয়ে শান্তনু কি যেন বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো।

তারপর মনোযোগ আবার ফিরিয়ে আনলো জয়শ্রীর দিকে। জয়শ্রী হাতের এপিঠ-ওপিঠ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠেকালো শান্তনুর কপালে। সেই কোমল ব্যাকুল হাতের ছোঁয়ায় শান্তনুর শরীর শিরশির করে। বোধহয় এক যুগ পরে, তার উষ্ণ কপালে কোনো নারীর হাত। শান্তনু লক্ষ্য করলো একটু চিন্তিত হলে জয়শ্রীকে আরও সুন্দর দেখায়। আজকের সকালটায় এমন আকস্মিক ভালো লাগা তার পাওয়ার ছিল, সে কি জানতো! শান্তনু জয়শ্রীর হাতটা কপাল থেকে সরিয়ে নিজের মুঠোয় বন্দী করে একটু চাপ দিল।

॥ ৭ ॥

সহস্র মিনতি যদি করে কর্ণ-মূলে
সমীরণ, ফোটে কি হে কভু পঙ্কজিনী,
কনক উদয়াচলে না হেরি মিহিরে—

—মাইকেল

অফিস যাবার জন্য তৈরী হয়েছেন হৃষীকেশ, আয়নার সামনে টাই বাঁধা হয়ে গেলে হাত ছড়িয়ে দাঁড়ালেন। জয়শ্রী কোট পরিয়ে দিল। বোতাম লাগিয়ে হৃষীকেশ বললেন, একটু মশলা নিয়ে আয় তো মা! মুখটা কেমন কেমন লাগছে!

মশলার কৌটো এনে জয়শ্রী বললো, মুখটা কি রকম লাগছে? ধুয়ে ফেলো না।

—ধুলাম তো ক'বার! খাবার সময় কি যেন একটা মশলা মুখে লাগলো, তারপর থেকেই এমন একটা বিশ্রী স্বাদ—

—একটু বেশি করে এলাচ খেয়ে নাও।

হৃষীকেশ ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, কাল অফিস যাবার সময় তোকে তো দেখিনি মিঠু, কাল কোথায় ছিলি?

—কাল আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।

—ওঃ!

এর থেকে বেশী কৈফিয়ত হৃষীকেশ চাইবেন না তাঁর মেয়ের কাছে। এতেই খুশী হয়ে বললেন, আচ্ছা, ছাখ তো, তোর কাকার হয়ে গেছে কি না!

বাবার সঙ্গে সঙ্গেই জয়শ্রী নেমে এলো দোতলায়। পরেশের রোজই দেরী হয়। এখনো তিনি টাইয়ের গিট ঠিক করছেন। কাকীমা তাড়া দিয়ে বললেন, কি তাড়াতাড়ি নাও না! বটঠাকুর নেমে এসেছেন। অফিস করার সময়েও তোমার দেরি, ফেরবার সময়েও দেরি। আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরো। মিঠু, আজ থিয়েটার দেখতে যাবি?

জয়শ্রী জিজ্ঞেস করলো, কি থিয়েটার?

—নিউ এমপায়ারে। শেক্সপীয়ারের নাটকের দল এসেছে বিলেত থেকে—ওর অফিসের সুগতবাবু চারখানা পাস পেয়েছেন।

জয়শ্রী মুখখানা একটু কঠিন করে বললো, না, তোমরা যাও। আমার

থিয়েটার দেখতে ভালো লাগে না।

—সে কি রে! এরা খুব ভাল করে। দিল্লিতে নাকি—

—তোমরা যাও না, আমি যাব না।

হৃষীকেশ ও পরেশের দুই আলাদা অফিস, কিন্তু যান এক গাড়িতে। পরেশ ঘর থেকে বেরুবার সময় জয়শ্রীকে একটু আদর করে বললেন, কিবে মিঠু, দিন দিন এত রোগা হচ্ছিস কেন?

—কোথায় রোগা? একে বুঝি রোগা বলে?

—তবে কি স্লিম? আজকালকার ফ্যাশান! দ্যাথ তো তোর কাকীমাকে, তোর ডবলের চেয়েও—

সুজাতা স্বামীর দিকে কড়া চোখে তাকাতেই পরেশ গট গট করে নেমে গেলেন সিঁড়ি দিয়ে। হৃষীকেশ আগেই গাড়িতে বসেছেন, পরেশ উঠে পড়ে ড্রাইভারকে বললেন, চলো—।

দুই ভাই, কিন্তু চেহারা একেবারে দু'রকম। হৃষীকেশ বেশ লম্বা, বয়েস হলেও মাথার সব চুল পাকেনি, ধীর স্থির মানুষ। পরেশ একটু ছটফটে, বেঁটে, গাট্টা-গোট্টা, মাথায় চকচকে টাক। দু'জনের বয়সের তফাত দশ বছর। অফিস যাবার সময় গাড়ির পথটুকুতে পরেশের ছটফটানির আর একটা কারণ, সিগারেট খেতে পারেন না, দাদার সামনে এখনো সিগারেট খান না। হৃষীকেশ পান-সিগারেট স্পর্শ করেন না কখনো। সিগারেটের অভাব পূরণ করার জন্য এইটুকু সময়ের মধ্যেই দু'তিনবার পান খেয়ে ফেলেন পরেশ।

হৃষীকেশের মুখে একটা অস্বস্তির ভাব। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, খাবার সময় মুখে কি যে পড়লো, এখনো সেই বিশ্রী স্বাদটা গেল না!

—তাহলে আজ একটা পান খেয়ে দেখবে নাকি?

—না।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। হৃষীকেশ আবার আপনমনে বললেন, গুরুদেবকে আসতে লিখেছিলাম। ওঁর চিঠি পেয়েছি, এই শনিবার আসছেন।

এবার পরেশের মুখ অপ্রসন্ন হয়ে গেল। খানিকটা অবহেলার সঙ্গে বললেন, গুরুদেব এসে আর কি করবেন! নিজেদের বুদ্ধিতে যদি না কুলোয়—

—গুরুদেব আসবেন আমার মনের শান্তির জন্য। গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দ পাই।

—গুরুদেব এলেই বাড়িতে এমন ভিড় ভাড়াক্কা শুরু হয়ে যায় দিন রাত দলে দলে লোক—

—তা তো একটু হবেই। গুরুদেবকে যারা ভালোবাসে—

আবার কিছুক্ষণ কথাবার্তা নেই। একটু উসখুস করে পরেশ বললেন, সেই ছেলেটির সঙ্গে তুমি একবার কথা বলবে নাকি?

—কোন ছেলেটি?

—আমাদের অফিসের যে-ছেলেটির কথা তোমাকে বলেছিলাম। সুগত রায়চৌধুরী, বৌদির তো ওকে খুব পছন্দ হয়েছে।

—তোমার বৌদি ছেলেটিকে দেখেছেন?

—হ্যাঁ, বৌদি একদিন সুজাতার সঙ্গে বেরিয়েছিলেন—রাস্তায়—সুজাতা তো ওকে ভালো করেই চেনে। দারুণ কোয়ালিফাইড, বিলেতে সাত বছর ছিল, এখানে চাকরিতেও খুব ব্রাইট কেরিয়ার, ফ্যামিলি ভালো, দেখতে শুনতেও—

—ওর সঙ্গে আমার কথা বলার কি দরকার আছে? তুমি বললেই তো হয়।

—হ্যাঁ, না, ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে একদিন—

—বেশ তো, কবে যাওয়া যায় তুমি ঠিকঠাক করো, গুরুদেব থাকতে থাকতেই যদি—ভালো কথা, ওঁরা আগে পাত্রী না দেখলে—

—সে তো দেখবেই। কিন্তু বুঝতেই পারছো, বিলেত ফেরত ছেলে, তার মতামতই আসল। মিঠুকে একবার দেখলেই পছন্দ হবে—কিন্তু মিঠু যে-রকম জেদী, ও কি আর রাজী হবে—

এ ব্যাপারটাকে একদম গুরুত্ব না দিয়ে হৃষীকেশ বললেন, রাজী হবে না কেন? আমি বললেই রাজী হবে। বিয়ে করতেই হবে যখন, তখন সে নিজেও একবার পাত্রকে দেখে নিলে—

—কিন্তু মিঠুর যে আবার আর একজনকে পছন্দ। সেই প্রফেসার ছেলেটি, তবে ব্রাহ্মণ নয়—

হাত দিয়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গি করে হৃষীকেশ বললেন, ও কিছু না, ও কিছু না।

—তা হলে এই ছেলেটিকে ডাকবো একদিন বাড়িতে? মুশকিল হচ্ছে কি, এই ছেলেটিও আবার খুব লাজুক, মানে ফর্মাল ভাবে পাত্রী দেখা ওর ঠিক পছন্দ নয়।

হৃষীকেশের অফিস আগে, তিনি পৌঁছে গেছেন। নামবার সময় বললেন, দ্যাখো কি করতে পারো।

হৃষীকেশের অফিসটি ছোট, কিন্তু তাঁর নিজস্ব। অর্থাৎ এ অফিসের পঞ্চাশ ভাগের মালিক তিনি নিজে, বাকি পঞ্চাশ ভাগের মালিক কখনো অফিসে আসে না। কর্মচারীরা এখনো হৃষীকেশকে ভয় অথবা সমীহ করে, তাঁর সামনে কেউ জোরে কথা বলে না। হৃষীকেশ নিজেও কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে, এবং সারাদিন নিজের চেম্বার থেকে বেরোন কদাচিৎ।

চেম্বারে ঢুকে তিনি ব্যাগটা নামিয়ে, কোটটা খুলে রাখলেন। টেবিলের কাচের তলায় চাপা দেওয়া একজন সন্ন্যাসীর ছবি। জটাজুটমণ্ডিত এক বিশাল চেহারার পুরুষ, ইনিই হৃষীকেশের গুরুদেব। আলোকচিত্রটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন হৃষীকেশ, যেন তিনি মনে মনে গুরুদেবের সঙ্গে কথা বলছেন।

সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই অন্য একদিকে নজর গেল। একটা পিঁপড়ের সারি চলেছে টেবিলের ওপর দিয়ে। অতিশয় ব্যস্ত পিঁপড়েগুলো, উভয় দিকেই তাদের যাওয়া আসার বিরাম নেই।

পিঁপড়ের রেখা দিয়ে অনুসরণ করলেন হৃষীকেশ। তাঁর কলমদানি ও টেলিফোনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কিছু মরে পড়ে আছে। একটা প্রজাপতি বা মথ বা গুবরোপোকা, ঠিক চেনার উপায় নেই—এত পিঁপড়েতে ঢাকা।

দুটি কারণে মন খারাপ হয়ে গেল হৃষীকেশের। এক, আজ তাঁর বেয়ারা টেবিল মুছে দেয়নি। বহু বছরের মধ্যে এরকম গাফিলতি তিনি দেখেন নি। দ্বিতীয়ত, এই যে আর একটা অশুভ চিহ্ন। প্রজাপতি বা গুবরোপোকা যাই হোক, তাঁর টেবিলে এসেই বা মরতে যাবে কেন? এত পিঁপড়েও যে এ বাড়িতে আছে, তাও তো তিনি জানতেন না।

অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে হৃষীকেশ বেয়ারাকে ডাকবার জন্য বেল বাজালেন।

দাদা নেবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সিগারেট ধরিয়েছিলেন পরেশ, সঙ্গে সঙ্গে চোখও বুজেছিলেন। বাকি মিনিট দশেক পথ তিনি রোজই একটু বিশ্রাম করে নেন—ভাত খাওয়ার পর কিরকম একটা ঘুমের আমেজ আসে, সিগারেট টানতে টানতে সেই সময়টা চোখ বুজে মৌজ করতে বেশ লাগে। অফিসে পৌঁছোনো মাত্রই আবার চটপটে ফিট।

সুগত রায়চৌধুরীকে তিনি পাকড়াও করলেন লাঞ্চ ব্রেকে। সিগারেট অফার করে বললেন, কি মশাই, আমাদের বাড়িতে কবে আসছেন, বলুন।

সুগতর পোশাক পরিচ্ছদ অত্যন্ত পরিপাটি। ক্রিম দিয়ে চুল আঁচড়ানো, একটি চুলও হাওয়ায় ওড়ে না, নিখুঁত দাড়ি কামানো, ফর্সা গালে একটা নীলচে আভা। সুটের কাট বিলিতি, জুতোর পালিশ আয়নার মতন, অর্থাৎ সুগত বেশ প্রাচীনপন্থী বিলেত ফেরত, এখনকার অনেক বিলেত ফেরত ছেলে খাস সাহেবদেরই মতন অত সব পারিপাট্যের ধার ধারে না। তবে মানুষটি অত্যন্ত বিনীত ও ভদ্র, কথাবার্তায় একটা পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ আছে।

সুগত হেসে বললো, যাবো একদিন—

—একদিন না, কালই আসুন। কাল সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে চা খাবেন,

আজ তো থিয়েটার যাচ্ছিই—আমার ভাইঝি ওখানে আজ আসতে পারবে না—কাল আপনি আসুন আমাদের বাড়িতে।

সুগত একটু চিন্তা করে বললো, কাল? কাল থাক, কাল আমার অন্য একটা কাজ—

—তা হলে পরশু?

—পরশু, মানে, পরশুও—এই সপ্তাহটা থাক না—

—কি ব্যাপার বলুন তো? আমার বাড়িতে যাওয়ার কথা তুললেই আপনি এড়িয়ে যান কেন? ভয় পান নাকি?

উত্তর না দিয়ে সুগত হাসি হাসি মুখে চুপ করে রইলো। পরেশ কিন্তু ছাড়লেন না, বললেন, খোলাখুলি বলুন তো, আপনার অন্য কোথাও ঠিক করা আছে? যদি থাকে তো আলাদা কথা—আর যদি না থাকে, তাহলে আমার ভাইঝিকে আপনি একবার দেখলেই বুঝবেন—নিজের ভাইঝি বলে বলছি না—কি বলুন, কোথাও ঠিকঠাক আছে?

—না, না, তা কিছু নেই।

—তবে, বিয়ে করবেন না ঠিক করেছেন?

—সে রকম কিছু প্রতিজ্ঞাও করিনি!

—তা হলে মেয়ে দেখা-টেখার ব্যাপারে আপত্তি? দেখুন মশাই, এটা বিলেত নয়, দিস ইজ বেঙ্গল। বিয়ে করে ফেলুন, আপনার উনত্রিশ বছর বয়েস, এই তো ঠিক সময়! নাকি আবার বিলেতে পালাবার কথা ভাবছেন? অনেকেই তাই যায়—

—আমিও হয়তো চলে যেতে পারি।

—ওখানে গিয়ে একটা মেম বিয়ে করবেন? সারা জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে যাবে বলে দিলুম।

সুগত এবার উচ্চহাস্য করে বললো, তা যাই বলুন, আমাদের পক্ষে মেম বিয়ে করাই উচিত। বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে কি করে বিয়ে হয়, তা-ই আমি বুঝতে পারছি না। টু বী ফ্র্যাংক, পাত্রী দেখা-টেখা আমার ঠিক পছন্দ হয় না। কিন্তু তাছাড়া আর কি ভাবে বিয়ে হয়? কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ হবার তো কোনো পথই নেই। বাইরে যাবার আগে আমি যে সব মেয়েদের চিনতাম, তাদের অনেকেরই বিয়ে হয়ে গেছে, যাদের হয়নি, তারা আর বিয়ের যোগ্য নেই। এখনকার অন্য মেয়েদের সঙ্গে তো আলাপ হবার কোনো উপায়ই নেই, তাদের বাবা-মায়ের যোগাযোগ ছাড়া। অ্যাবসার্ড!

পরেশ মন দিয়ে সুগতর পুরো কথাগুলো শোনেন নি। মাঝপথে দু'একবার

বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। শেষ হতেই বললেন, ওরকম পাত্রী দেখার মতন ভাবছেন কেন? সেই প্রিমিটিভ প্রথা কি আর আছে? আমাদের বাড়িতে আসবেন, চা খাবেন, আমার ভাইঝির সঙ্গে আলাপ হবে, কথা-টথা বলবেন— লোকের বাড়ি গেলে এরকম আলাপ হয় না? আপনি কি আর তার সঙ্গে বিয়ের কথা বলবেন?

—কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি আগে থেকেই জানা থাকে—

—অত ভাবলে চলে না। এসে দেখুনই না। কবে আসবেন? পরশুই ঠিক রইলো তাহলে?

স্বগত একটু রূঢ় ভাবেই বললো, না, এখন থাক। তারপর উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

নিজের ঘরে ফিরে কাজ শুরু করার আগে স্বগত থুতনিতে হাত দিয়ে হাসি-মুখে একটুক্ষণ বসে রইলো। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা নীল খাম বার করলো। দেশে ফেরার পর এই প্রথম তার নামে কোনো অনাত্মীয় মেয়ের চিঠি। চিঠিখানা আবার পড়লো স্বগত। হাতের লেখা ভালো নয়, বোঝাই যায় ঝোঁকের মাথায় লেখা, সংক্ষিপ্ত চিঠি।

স্বগতবাবু,

আমার বাবা এবং কাকা আমার বিয়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহী হয়েছেন। আমার কাকীমার মুখে প্রায়ই আপনার নাম শুনি, উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই, আমার বিয়ে আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। সেখানেই আমার বিয়ে হবে—এতে কোনো ভুল নেই। আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, অনেক ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়। আপনাকে আমি চিনি না, তবু অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের বাড়িতে আসবেন না, আমাকে অপ্রীতিকর অবস্থায় ফেলবেন না। আমি কামনা করি, আপনি আপনার মনোমত সহধর্মিণী পেয়ে জীবনে সুখী হবেন। আমাকেও সুখী হতে দিন। এই চিঠির কথা অনুগ্রহ করে কাউকে বলবেন না।

ইতি—

জয়শ্রী মুখার্জি

কৌতুকময় মুখে চিঠিখানার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো স্বগত। সে একজন শিভালরাস যুবক, অপরের প্রতি প্রণয়াশক্তা কোনো যুবতীর প্রতি বল-প্রয়োগ করার চিন্তা তার একবারও মনে আসে না। বলা বাহুল্য ঐ মেয়েটির জীবনে সে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। ওর কাকা বড্ড বেশী জ্বালাতন করছেন, তাও আস্তে আস্তে ঠিক করে দেওয়া যাবে।

তবে একথাও ঠিক, মেয়েটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে স্বগতর। বোঝা যাচ্ছে, বেশ তেজস্বিনী মেয়ে, খুব ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার, একবার শুধু চোখের দেখাও হবে না ?

॥ ৮ ॥

"...বুঝিবে সে কিসে কভু আশী বিষে দংশেনি যারে—"

অনুরাধা, তুমি আমাকে একটু বিষ যোগাড় করে দিতে পারো ?

—রুমাবৌদি, এসব কথা বলছেন কেন ?

—না ভাই, আমার আর একটুও বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এরকমভাবে বেঁচে থাকার কোনো কি মানে হয় ? আমার তো যা হবাব হয়েছেই ঐ মানুষটাকেও দিনের পর দিন কষ্ট দিচ্ছি।

—আপনি আবাব ঠিক সেবে উঠবেন, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিয়ে তো লাভ নেই। আমি সব জানি। আমি তো এমনিতে সেবে গেছিই, কিন্তু আমাব মেরুদণ্ডের হাড় আর জোড়া লাগবে না। আমি আব কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবো না।

—আজকাল চিকিৎসার এত সব উন্নতি হয়েছে—

—সে সব আমার জন্য নয়। তুমি আমাকে একটু বিষ এনে দাও, তোমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না, আমি লিখে রেখে যাবো, আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায়—

পরিবেশটাকে একটু হাল্কা কবার জন্য অনুবাধা একটু হেসে বললো, বিষ কোথায় পাওয়া যায়, তা আমি জানবো কি করে! পাওয়া গেলে তো আমি নিজেই খেতাম।

—তুমি বিষ খাবে কেন ? তোমার দুঃখ কি !

—আছে। এক সময় আমারও ইচ্ছা করে।

অনুরাধা তখনও হাসছে। কিন্তু রুমাবৌদির মুখে হাসি নেই। শুকনো ফ্যাকাসে মুখখানায় জলজল করছে চোখ দুটো। রুমাবৌদি এক সময় বেশ সুন্দরীই ছিলেন, এখনো দেখলে বোঝা যায়—যথেষ্ট লম্বা, দেহের গড়ন দেখলেই মনে হয়, বেশ স্বাস্থ্য ভালো ছিল।

রুমাবৌদি আবার ব্যাকুলভাবে বললো, গোটা কয়েক ঘুমের বড়িও যোগাড় করে দিতে পারো না ? যদি দাও, তা হলে তোমার কোনো পাপ হবে না, একজন মানুষের উপকার করাই হবে। আমি তোমার দাদাকেও বলি—

—আপনার সত্যি সত্যি মরে যেতে ইচ্ছে হয়! মরে গেলেই তো সব শেষ। তারপর যে আর কিছু নেই!

রুমাবৌদি মুখ ফিরিয়ে তাকালেন বাইরের জানলার দিকে, ভাঙা ভাঙা গলায় আপন মনে বললেন, কি জানি পরে আর কিছু আছে কিনা। তবে মাঝে মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি, আমি আবার ছোট্ট হয়ে গেছি, ফ্রক পরা, ছাদে যেরকম ব্যাডমিণ্টন খেলতুম আগে···না, অনুরাধা, সত্যি আর আমার এরকম ভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে না!

—আপনার মেয়ের কথা ভেবেও? রিনির এইটুকু মোটে বয়েস—

রুমাবৌদির একটা চোখের পাশ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরিয়ে খুব শ্লথ গতিতে গড়িয়ে নামলো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে সেটা মুছে বললেন, আমি বেঁচে থেকেই বা ওর কি করতে পারছি?

রুমাবৌদি আজ দু' তিনদিন ধরে বেশ ভালো আছেন। সেইজন্যই বোধহয়, এখন তাঁর বেশী করে মরে যেতে ইচ্ছে করছে! পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের কথা বেশী করে মনে পড়ছে ওঁর। যখন শরীরটা বেশী খারাপ থাকে—তখন ওঁকে প্রণবেশদার সঙ্গে খিট খিট করতে দেখেছে অনুরাধা। প্রণবেশদা অবশ্য মাটির মানুষ, কোনদিন একটাও জোরে কথা বলেন না।

রুমাবৌদির ওপর সহানুভূতি হয় অনুরাধার, তবু একজন অসুস্থ মানুষের মৃত্যুবিষয়ক কথাবার্তা বেশীক্ষণ শুনতে ভালো লাগে না। প্রণবেশদার জন্যও মমতা হয়, কিন্তু প্রণবেশদাকে এড়িয়ে না চলা ছাড়া উপায় নেই।

রুমাবৌদি বললেন, রিনি কোথায়? সাড়া শব্দ পাইনি। আমার কাছে তো আসেই না।

অনুরাধা বললো, ওপরে, আমাদের ঘরে গিয়ে খেলা করছে।

—তোমাদের নিশ্চয়ই খুব জ্বালাতন করে।

—না, না, কিচ্ছু জ্বালাতন করে না—ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। আমি গিয়ে ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—

উঠে পড়ার এই একটা সুযোগ পেয়ে খুশী হলো অনুরাধা। এঘরে ঢুকতে বা বেরুতে গেলে প্রণবেশের ঘরটা পেরিয়ে যেতে হয়। প্রণবেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একটা মোটা বই পড়ছিলেন। অনুরাধা কোন কথা না বলেই চলে যাচ্ছিল, প্রণবেশ বই থেকে মুখ না তুলেই বললেন, অনুরাধা, শোনো—

অনুরাধা তো কোনো অপরাধ করেনি, তবে কেন সে চুপি চুপি প্রায় শব্দ না করেই চলে যাচ্ছিল? আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, কি বলুন!

—একটু এদিকে এসো—

—বলুন না

—এদিকে এসো—

প্রণবেশের গলার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যা সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই শান্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটিকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে বলা যায় না, না, আমার দরকার আছে, এখন কথা বলতে পারছি না। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে অনুবাধা এগিয়ে এসে টেবিল থেকে খানিকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে বললো, কি ?

ধীরেসুস্থে প্রণবেশ হাতের বইটা মুড়ে টেবিলে রাখলেন। অনুরাধা দেখলো, বইটা ইমানুয়েল কান্ট-এর লেখা "Critique of Pure Reason"; বিদেশী যন্ত্রপাতির কোম্পানির সেল্‌স ডিপার্টমেন্টে কাজ করে যে লোক, তার যে কেন এরকম খটোমটো বই পড়ার শখ, তা কিছুতেই বুঝতে পারে না অনুরাধা। হয়তো প্রণবেশদা অন্যরকম হতে চেয়েছিলেন, ছেলেবেলায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল অন্য কিছু হবার—জীবনের সব কিছুই ভুল হয়ে গেছে।

প্রণবেশ তাকালেন অনুরাধার দিকে, সেই সর্বগ্রাসী দৃষ্টি, যাতে অনুরাধার শরীরটা শিরশির করে। বেশ কয়েক মুহূর্ত প্রণবেশ সেই রকম ভাবে তাকিয়ে থাকেন, তাঁর সর্বাঙ্গ নিথর, একটুও নড়াচড়া করে না। তারপর যেন ঘোর ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন, চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোমাকে দু'দিন দেখিনি।

—কালও আমি এসেছিলাম তো !

—দুপুরবেলা তখন আমি থাকি না। কিন্তু তুমি যে এসেছিলে, তা আমি বুঝতে পারি। ঠিকই বুঝতে পারি।

—আপনি আমাকে কিছু বলবেন ?

—হ্যাঁ।

তবুও প্রণবেশ কিছু বলেন না। বইটা শব্দ করে টেবিল থেকে পড়ে যেতেই তাড়াতাড়ি সেটাকে তুললেন, যত্ন করে কাল্পনিক ধুলো ঝাড়লেন। আবার তাকালেন অনুরাধার দিকে।

—কই, কিছু বলছেন না তো। আমি এবার যাবো।

—ও হ্যাঁ, একটু দাঁড়াও।

ড্রয়ার খুলে একটা ছোট কাগজের বাক্স বার করলেন প্রণবেশ। সেটা অনুরাধার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ জিনিসটা কেমন গ্যাখো তো ? আজ হঠাৎ কিনলাম—

বাক্স দেখেই অনুরাধা চিনতে পেরেছিল, ভেতর থেকে বার করলো একটা বিদেশী পারফিউমের শিশি ! নারীসুলভ উত্তেজনায় বললো, বাঃ এটা তো দারুণ জিনিস, ইনটিমেট, খুব চমৎকার গন্ধটা।

প্রণবেশ বললেন, ভালো ? আমি তো এসব সেন্ট টেন্ট চিনি না—

—এটা তো ইম্পোর্টেড! সবাই জানে এটার নাম। আপনার টেস্ট আছে।

—সত্যি সত্যি ভালো বলছো তো? না, এমনি?

জিনিসটা ফেরত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে অনুরাধা বললো, না, সত্যিই ভালো।

প্রণবেশ ফেরত নিলেন না, অত্যন্ত লাজুকভাবে বললেন, এটা আমি তোমার জন্য এনেছি।

অনুবাধাব মুখে এক ঝলক রক্ত এসে গেল। একটু তীক্ষ্ণ গলায় বললো, কেন, আমার জন্য এনেছেন কেন?

প্রণবেশ হাসবার চেষ্টা কবে বললেন, কেন, তার কোনো যুক্তি নেই। কাণ্টও বলেছেন, যুক্তি দিয়ে পৃথিবীর সব রহস্যের মীমাংসা করা যায় না!

—বাঃ, তা বলে আমি নেবো কেন? আপনি এটা বৌদিকে দিন। বৌদিব মন ভালো থাকবে।

প্রণবেশ ড্রয়ার খুলে আর একটা অবিকল ঐ বকম সেণ্টের শিশি বার করে বললেন, দুটো এনেছি। একটা রুমার জন্য, একটা তোমার—

—দুটো? এর যে অনেক দাম!

—আমি একটু সস্তায় পেয়েছি।

—দুটোই তা হলে বৌদিকে দিন, আমি নেবো না।

—কেন?

—আমি পারফিউম-টারফিউম বেশি ব্যবহার করি না।

—তা হলে তুমি এটার নাম জানলে কি করে? দেখেই চিনতে পারলে—

—ও সব মেয়েরাই জানে। আমার বন্ধুটন্ধু ব্যবহার করে—

—অনুরাধা, তুমি এটা যদি নাও আমি অত্যন্ত খুশী হবো। আমি তোমার কথা ভেবেই এটা এনেছি।

প্রণবেশের গলার মধ্যে এমন একটা ব্যাকুল মিনতি ছিল যে অনুরাধা প্রায় কেঁপে উঠলো। পরক্ষণেই সে নিজেকে শক্ত করে ফেললো। রুমাবৌদি কি পাশের ঘর থেকে এসব কিছুই শুনতে পান না? মানুষের একটা অঙ্গ দুর্বল হয়ে গেলে অন্য অঙ্গগুলো অনেক সময় বেশি প্রখর হয়ে ওঠে। রুমাবৌদি তো অন্তত এটুকু বুঝতে পারছেন যে অনুরাধা ঝিনিকে ডাকতে যাবার জন্য বেরিয়েছিল, অথচ এখনও ও-ঘরে রয়েছে।

প্রণবেশ আবার সেইরকম গলায় বললেন, তোমাকে এটা দিতে চাওয়ার মধ্যে কি কোনোরকম অন্যায় আছে?

অনুরাধা কঠিনভাবে বললো, আপনার কাছ থেকে এরকম একটা দামী জিনিস আমি নিতে যাবো কেন ?

—কারণ এটা তোমাকে মানাবে। তোমার সুন্দর চেহারা, তুমি যদি এটা মেখে সামান্য একটু আনন্দ পাও, তাহলে, আমি ধন্য মনে করবো নিজেকে।

—নাঃ। আর কক্ষনো আপনি আমাকে এরকম কিছু বলবেন না!

—দাঁড়াও, চলে যেও না, একটু দাঁড়াও। তুমি এটা নেবে না তাহলে ?

—না বললাম তো—

—এটা আমি তোমার জন্যই এনেছিলাম। তাহলে আর এটা থাকার কোনো দরকার নেই।

প্রণবেশ শিশিটার ছিপি খুলে বিনাদ্বিধায় সবটুকু ঢেলে ফেললেন ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে, তারপর শিশিটাও ফেলে দিলেন সেখানে।

প্রণবেশকে কক্ষনো রাগ করতে দেখেনি অনুরাধা। এখন কঠিন রাগে তাঁর চোয়াল দুটো শক্ত। কিন্তু তাঁর ক্রোধ সুগন্ধ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। বিদেশী পারফিউমের মিষ্টি মাদক গন্ধে ম ম করছে বাতাস। চেয়ার ছেড়ে একবারও ওঠেননি প্রণবেশ, তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন অনুরাধার দিকে। সেই দৃষ্টি ও সুগন্ধের ঝাপটা কাঁপিয়ে দিল অনুরাধাকে. তাড়াতাড়ি সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অনুরাধা ট্রামে উঠতে যাচ্ছে, দেখলো অঞ্জন হন হন করে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অনুরাধা উঠে পড়ার পর চলন্ত ট্রামে বিপজ্জনকভাবে উঠে পড়লো অঞ্জন। এক মুখ হেসে জিজ্ঞেস করলো, টুকুদি কোথায় যাচ্ছো ?

—এই যাবো আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে। আমার এক মাসির বাড়িতে!

দুজন ভদ্রলোক অনুরাধাকে দেখে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে লেডিস সিটটা থেকে উঠে দাঁড়ালো। অনুরাধা বসার পর আর কারুকে কোনো সুযোগ না দিয়ে অঞ্জন ঝপ করে বসে পড়লো তার পাশে। তারপর বললো, আমহার্স্ট স্ট্রীট যাচ্ছো, বাসে না গিয়ে ট্রামে যে ?

অঞ্জনের সঙ্গে একদম কথা বলতে ইচ্ছে করে না অনুরাধার। দিন দিন বড্ড বেশি বখাটে হয়ে উঠছে। কিন্তু এসব মামুলি কথার উত্তর না দিয়েও তো পারা যায় না! বললো, বাসের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ, পেলাম না। তাই ট্রামে উঠলাম। এসপ্ল্যানেড থেকে বদলে নেবো। তুমি কোথায় যাচ্ছো ?

—এই এমনি একটু হাওয়া খেতে।

যেন সব হাওয়া জানলার বাইরেই, ট্রামের মধ্যে একটুও হাওয়া নেই। তাই বাইরের হাওয়া খাওয়ার জন্য অঞ্জন অনুরাধার দিকে অনেকটা ঘেঁষে এলো।

কণ্ডাকটর আসবার পর সে পয়সা বার করতে গিয়েছিল, কিন্তু অনুরাধাই টিকিট কাটলো বাধ্য হয়ে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে অঞ্জন বললো, তুমি আজ এখন আমহার্স্ট স্ট্রীটে যাবে? পাগল নাকি!

—কেন? কি হয়েছে?

—কলেজ স্ট্রীটে দারুণ গোলমাল হচ্ছে। দেখছো না, ওদিকের সব বাস বন্ধ।

—সত্যি?

—সত্যি নাকি বানিয়ে বলছি!

উদ্বেগে অনুরাধার ভ্রূ কুঁচকে এলো। এসপ্ল্যানেডে এসে বুঝলো, কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। ট্রাম-বাসের বিপুল অব্যবস্থা। কলেজ স্ট্রীটের দিকে কিছুই যাচ্ছে না—অন্য পথ ঘুরে আমহার্স্ট স্ট্রিটে যাওয়া যায় অবশ্য, কিন্তু সেখানকার অবস্থাই বা কি রকম কে জানে! অনুরাধার ঝুঁকি নিতে ইচ্ছে হলো না।

অঞ্জন তখনও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, অনুরাধা তাকে বিদায় দেবার ভঙ্গি করে বললো, ঠিক আছে, চলি।

—তুমি এখন কোথায় যাবে? চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

—আমি কোথাও যাবো না।

—আহা, বাড়ি ফিরবে তো? চলো আমিও তোমার সঙ্গে ফিরবো।

—কেন, তুমি যে হাওয়া খাবে বলেছিলে? হয়ে গেল?

—টুকুদি, চলো না একটু আউটরাম ঘাটের দিকে যাই। তোমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে দেবো!

অনুরাধা হেসে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা অঞ্জন, তোমার কোনো মেয়ে-বন্ধু নেই? তোমার বয়েসী ছেলের—

অঞ্জন ফস করে বললো, তোমারও তো কোনো ছেলে-বন্ধু নেই!

—কি করে জানলে?

—চলো না বাবা, একটু আউটরামে গিয়ে বসি। সেখানে বসেই এসব আলোচনা হবে। এমন ফার্স্ট ক্লাস হাওয়া দেয় ওখানে—বিনা পয়সার হাওয়া—

অনুরাধা বললো, দারুণ মেঘ করেছে দেখেছো? এর মধ্যে আমার হাওয়া খাওয়ারও ইচ্ছে নেই, আর তোমার সঙ্গে ওসব বিষয়ে আলোচনা করারও ইচ্ছে

নেই। আমি ঐ টেলিফোনের বুথে গিয়ে একটা টেলিফোন করবো, তুমি এখন কেটে পড়ো—

—আমাকে ওরকম কাটিয়ে দিতে চাইছো কেন? আর কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে?

—হ্যাঁ, আছে।

—সব বুঝি সব বুঝি। সেরকম তো এনথু দেখছি না!

—এনথু মানে?

—হাঃ হাঃ। চলো, আমি তোমার সঙ্গে টেলিফোন বুথ পর্যন্ত যাই।

অঞ্জন নাছোড়বান্দার মতন লেগে রইলো অনুরাধার পাশে পাশে। কালো রঙের সরু প্যাণ্ট পরেছে অঞ্জন, জামাটাও সেইরকম টাইট, কানের লতি পর্যন্ত বড় জুলপি। ঠোটের অতি-চালাক ভঙ্গিটি বাদ দিলে ছেলেটিকে সুদর্শনই বলা যায়। বয়েসে যে সে অনুরাধার থেকে ছোট, একথা যেন তার মনেই থাকে না, কথাবার্তার ভাব এইরকম। এই জন্যই ওকে পছন্দ হয় না অনুরাধার।

কিন্তু ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবারও তো কোনো উপায় নেই। এসপ্ল্যানেডে জনারণ্য তবু অনুরাধা ওকে ধমকে বলতে পারবে না, তুমি যাও, আবার পাশ থেকে সরে যাও!

অনুরাধার মনে হলো, এর থেকে যে কোনো একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম-প্রেম খেলা খেললেই হতো! কলেজে পড়ার সময় রজত বলে একটা ছেলে তাকে খুব জ্বালিয়েছে। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা ছিল রজতের। তাকে প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত ছিল বোধ হয়। প্রেম-ট্রেম করলে মেয়েদের তবু রাস্তায় ঘাটে একজন বডিগার্ড থাকে। তা ছাড়া তো মেয়েদের একলা চলাফেরা করার উপায় নেই। ভিড়ের ট্রামে-বাসে উঠলে অসভ্য লোকেরা গা ঘেঁষে দাঁড়াবে, একা সিনেমায় যাওয়া যাবে না, একা ট্যাক্সিতে চাপা যাবে না। একা বাস স্টপেও বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যায় না। রজতের মতন কেউ সঙ্গে থাকলে-কি আর অঞ্জন কাছে ঘেঁষতে পারতো!

অনুরাধা টেলিফোন করছে, আর বুথের বাইরে অঞ্জন পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সে বেরিয়ে আসবার পর অঞ্জন বেশ স্বাভাবিকভাবে বললো, চলো—

—কোথায়?

—চলোই না! তোমাকে আমি আজ খাওয়াবো।

—আমি কোথাও যাবো না। আমি এখন সোজা বাড়ি যাবো।

—আচ্ছা টুকুদি, তুমি আমাকে দেখলেই এরকম করো কেন বলো তো?

আমি কি একটা রাস্তার ছেলে নাকি ? তুমি তো আমহার্স্ট স্ট্রীটে যাচ্ছিলেই —অন্তত দু'ঘণ্টা টাইম লাগতো। তা হলে এক্ষুনি বাড়ি ফিরে কি করবে ? বেড়াতে যদি না যেতে চাও, চলো, তা হলে একটা সিনেমায় যাই।

হঠাৎ মত বদলে ফেললো অনুরাধা। বললো, ঠিক আছে, চলো, একটা সিনেমা দেখে আসি। কিন্তু টিকিটের দাম আমি দেবো!

অঞ্জন উল্লাসের সঙ্গে বললো, নো অবজেকশান! আমার পয়সাকড়ির ব্যাপারটা একটু টাইট যাচ্ছে। দাঁড়াও একটা চাকরি ফাকরি পেয়ে নিই—

—চাকরির চেষ্টা করছো ?

—পাগল! আজকাল তো শুধু বোকারাই চাকরির চেষ্টা করে। ওতে শুধু পয়সা নষ্ট আর এনার্জি নষ্ট। কয়েকজনকে বলে রেখেছি শুধু, চাকরি যদি হবার তো আপসে হবে!

—শুধু বলে রাখলেই চাকরি হয় ?

—তা ছাড়া আর কিসে হয় ? বুঝলে না, কিছু লোককে মার্ডার না করলে চাকরি খালি হবার চান্স নেই। তোমাদের আর কি! মেয়েরা এখনো গটাগট চাকরি পেয়ে যায়!

—মোটেই না। আমার সঙ্গে যারা পড়তো, তার কত মেয়ে এখনো বেকার বসে আছে। অনেকের এত বেশী দরকার—

—ওসব শখের! ওসব শখের!

—খুব ভালো ধারণা তোমাদের। আমি যে চাকরি করি, সেটা কি শখের ?

—তোমার বাবা তো এখনো চাকরি করেন ?

—তোমার বাবাও তো চাকরি করেন অঞ্জন! আমি অস্বীকার করছি না যে, তোমার চাকরি পাওয়া খুবই দরকার—কিন্তু তুমি যে, মার্ডার করার কথা বললে, ঐ যুক্তিতে যদি আমার বাবা কিংবা তোমার বাবাকে কেউ মার্ডার করে—

—নাও, নাও, ওসব কথা এখন থাক। এরপর আর টিকিট পাবো না—

সিনেমা হলে ঢুকে প্রথম দিকটায় অনুরাধা বেশ স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল। ইন্টারভ্যাল-এ অঞ্জন তার জন্য পপ কর্ন কিনে আনলো, টুকটাকি গল্প হলো নানারকম।

বই শুরু হবার দশ মিনিট বাদেই গাঢ় অন্ধকারে অঞ্জন তার হাতটা তুলে দিল অনুরাধার কাঁধের ওপর দিকে। ব্যাপারটা অনুরাধার খারাপ লাগলো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না। একটু নড়ে চড়ে সিধে হয়ে বসলো, যদি অঞ্জন

নিজে থেকেই সরিয়ে নেয়। সরালো না। বরং একটু বাদে, অনুরাধা টের পেল তার বাহুতে অঞ্জনের আঙুলের ছোঁয়া। সেই আঙুল কোনো পোকার মতন গুটি মেরে এগোতে লাগলো। অনুরাধা কঠিন চোখে তাকালো অঞ্জনের দিকে, চোখাচোখি হলো না। অঞ্জন যেন এসব কিছু জানেই না, সে গভীর মনোযোগ দিয়ে ফিল্ম দেখছে।

অনুরাধা জোর করে অঞ্জনের হাতখানা সরিয়ে দিল। সরে গেল হাতটা, কিন্তু ফিরে এলো মিনিট দু-এক বাদেই। আরও দুঃসাহসী হয়ে। এবার সে অনুরাধার বাহুটা আঁকড়ে ধরেছে। অসহ্য রাগে অভিমানে যেন অনুরাটার দম আটকে গেল। বেশী নড়াচড়া করতে সাহস পাচ্ছে না। আশপাশের লোকেরা যদি সচকিত হয়ে ওঠে। অনুরাধা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার সমস্ত মনোযোগ তার ডানবাহুর ওপর একটা শক্ত হাতের দিকে।

ছবির পর্দায় ঘোড়সওয়ার নায়ককে তাড়া করেছে পাঁচজন দুর্বৃত্ত। কি প্রচণ্ড দারুণ রোমাঞ্চকর দৃশ্য, আব কি প্রচণ্ড গতির খেলা। আর এদিকে অঞ্জনের দুটো আঙুল অত্যন্ত আস্তে আস্তে এগোচ্ছে অনুরাধার বুকের দিকে। অঞ্জনের চোখ ছবির দিকে সাঁটা। কান্না পেয়ে গেল অনুরাধার। এরা কি চায়, এরা কি ভাবে আমাদের ?

অঞ্জনের আঙুল অনুরাধার বুক স্পর্শ করতেই অনুরাধা লোকলজ্জা ভুলে গিয়ে ঝুঁকে পড়লো সামনের দিকে। এক ঝটকায় সরিয়ে দিল অঞ্জনের হাত। এবার অঞ্জন অনুরাধার দিকে তাকিয়ে লুব্ধভাবে একটু হাসলো। অনুরাধা দু'চোখে আগুন ঝরিয়ে তাকিয়েছে, কিন্তু অন্ধকারে আর সে আগুন কতটা দেখা যাবে।

কিছুক্ষণ আবার শান্তভাবে ছবি দেখা। অনুরাধা এখন গল্পের খেই হারিয়ে ফেলেছে। তার কিছুই ভালো লাগছে না—মনে মনে ভাবছে, কতক্ষণে শেষ হবে এই হতচ্ছাড়া ফিল্ম ! কিন্তু এখনো আর্দ্ধেকও হয়নি। অনুরাধা সজাগ হয়ে আছে, আর কিছুতেই সীটে হেলান দেবে না।

গুলি খেয়ে নায়ক ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলের দর্শকরা অনেকেই ভয়ের অস্ফুট শব্দ করলো ! সেই মুহূর্তে অঞ্জনের একটা হাত চেপে ধরলো অনুরাধার উরু। যেন সেও ভয় পেয়েছে। অনুরাধা একেবারে শিউরে উঠলো। এভাবে তার উরুতে কোনো পুরুষের হাত ! সে জোর করে সরিয়ে দিতে গেল অঞ্জনের হাত, কিন্তু পারলো না। অঞ্জন লোহার মতন শক্ত আঙুলে তাকে ধরে আছে, অনুরাধা জোর করে কিছুতেই তাকে সরাতে পারছে

না। নিজের ভেতরকার রাগের চেয়েও অনুরাধার বেশী লজ্জা হতে লাগলো এই ভেবে যে, আশেপাশের কেউ যদি দেখে ফেলে, তা হলে তাকে কি খারাপ মেয়ে ভাববে!

অনুরাধার মুখ চোখ গরম হয়ে গেছে, উরুর কাছটিতে যেন আগুন জ্বলছে। কেন সে এসেছিল! এসব ছেলেকে বিশ্বাস করাই ভুল হয়েছে। সে ভেবেছিল, ছেলেটা তো রোজ ঘ্যান ঘ্যান করে, একদিন একটু সিনেমা দেখলে আর কি আসে যায়! কিন্তু অঞ্জন আসলে সিনেমা দেখতে চায়নি, আউটরাম ঘাটে গেলেও সে হাওয়া খেত না। অঞ্জনের হাত সরাতে পারলো না অনুরাধা, প্রচণ্ড জোরে চিমটি কাটলেও সে হাত সরায় না, মুখ ফিরিয়ে হাসে। অগত্যা অনুরাধা সেখানেই অঞ্জনের হাত শক্ত করে ধরে রইলো, যাতে আর কোনোদিকে না যায়। অনুরাধার সিল্কের শাড়িপরা উরুতে খেলা করতে লাগলো একটি দুর্বিনীত ছেলের আঙুল।

সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে দুজনেই নিঃশব্দ। খানিকটা বাদে ভিড় ছাড়িয়ে এসে অঞ্জন রীতিমত স্বাভাবিক গলায়, স্বাভাবিক হাসির সঙ্গে বললো, বেশ বইটা! পল নিউম্যান দুর্দান্ত পার্ট করেছে। তোমার কি রকম লাগলো?

অনুরাধা উত্তর দিল না।

—টুকুদি, তোমার ভালো লাগেনি?

—অঞ্জন, তুমি আমার সঙ্গে জীবনে আর কক্ষনো কথা বলতে এসো না!

—আরেঃ, কি হলো কি?

অনুরাধা বাইরের আলোয় অঞ্জনের মুখের দিকে ভালো করে তাকালো। সেখানে কোনো অপরাধবোধ নেই, শুধুই প্রচ্ছন্ন কৌতুক। সবই যেন খেলা। সেইরকম হাল্কাভাবেই অঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, একটু চা খেয়ে যাবে?

—না।

—তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে? ঠিক আছে, চলো একটা ট্যাক্সি নিই! তুমি সিনেমা দেখালে, আমি ট্যাক্সি ভাড়াটা—

—তোমার যাতে খুশী ইচ্ছে যাও! আমি বাসে যাবো—

—তুমি হঠাৎ আমার ওপর এরকম খাপচুরিয়াস হয়ে গেলে কেন? কি হয়েছে কি? নাথিং সিরিয়াস!

—অঞ্জন, তুমি আমাকে কি ভাবো বলো তো?

—কি আবার ভাববো!

—আমি তোমার চেয়ে বয়েসে বড়ো, তুমি আমাকে দিদি বলে ডাকো, তারপরেও এরকম অসভ্যতা—

—আ হা-হা, আর মেয়েরা যে কত ছেলেকে দাদা দাদা বলে ডেকে তারপর তার সঙ্গেই লদকা-লদকি—

—আমি আর কক্ষনো তোমার সাথে কথা বলতে চাই না। তোমাদের মতন ছেলেদের দেখলে—

অঞ্জন চোখ মুচড়ে বললো, বা বা, তুমি প্রণবেশদার সঙ্গে দরজা বন্ধ করে গুজগুজ ফুসফুস করতে পারো আর আমি একটু নেকিং করলেই দোষ ?

—অঞ্জন !

—আমাকে ওসব নকসা দেখিও না ! আমি সব জানি। তুমি ভাবো তোমাকে কেউ দেখতে পায় না। বৌকে ধোঁকা দিয়ে প্রণবেশদার এদিকে তোমার সঙ্গে—

—অঞ্জন, এসব কি বলছো কি !

—ঠিকই বলছি। আমাকে ঘাঁটিয়ো না। বুঝলে টুকুদি আমাকে ঘাঁটিয়ো না। বেশি এদিকওদিক করলে আমি পাড়াময় সব্বাইয়ের কাছে রটিয়ে দেবো। তখন বুঝবে ঠ্যালা। তোমার প্রণবেশদাই বা কোথায় থাকে আর তুমিই বা কোথায় থাকো।

—তুমি যাকে খুশী, যা ইচ্ছে বলতে পারো।

অঞ্জন কাছে এসে অনুরাধার হাত ধরার চেষ্টা করে বললো, তুমি হঠাৎ এরকম টেম্পার লুজ করলে কেন টুকুদি ? আমি তো তোমায় এমন কিছু বলিনি !

অনুরাধা বললো, তুমি ফের যদি আমার গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করো, তা হলে থাপ্পড় খাবে আমার কাছে।

যে কোনো কারণেই তো রাস্তায় ভিড় জমে যায়, ওদের কাছেও কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে। কে কি ভাবছে সেদিকে আর ভ্রূক্ষেপ নেই অনুরাধার, হনহন করে হেঁটে গেল বাস স্টপের দিকে। অঞ্জন কিছুক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে পড়লো।

দিন সাতেক পরে অনুরাধা রাত আটটা আন্দাজ হাজরা মোড় থেকে ফিরছিল, দু তিনজন বন্ধুর সঙ্গে অঞ্জন তার পেছনে লেগেছে। মাঝে মাঝে তারা অনুরাধার গা ঘেঁষে যাচ্ছে, শুনিয়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক খারাপ কথা অনুরাধা নিরেট মুখ করে আছে। অঞ্জন একই বাড়িতে থাকে, অথচ কিছু বলা যাবে না। কি বলবে ? কাকে বলবে ? রাস্তা দিয়ে আরও তো কত মেয়ে যাচ্ছে, অনেকেই একলা, ওদের তো কেউ বিরক্ত করছে না।

হঠাৎ মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল শান্তনুর সঙ্গে। অনুরাধা একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো। একবার ভাবলো, দু' একটা কথা বলে শান্তনুকে এড়িয়ে যাবে। শান্তনুর সামনেই যদি অঞ্জনরা এসে কোনো কথা বলে! পরমুহূর্তেই সে মনের সব গ্লানি দূর করে দিল! ওদের জন্য সে কেন তার স্বাভাবিক জীবন থেকে বঞ্চিত হবে! শান্তনুর সঙ্গে কথা বলতে তার ভালোই লাগে।

কথা বলতে বলতে দুজনে হাজরা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়ালো। আড়চোখে দেখলো, অঞ্জনেরা দূরে একটু দাঁড়িয়ে থেকে সরে পড়লো খানিকটা বাদে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসিমুখে অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, কি, কতদিন দেখা হয়নি?

হাতের পাঞ্জা তুলে দেখিয়ে শান্তনু বললো, পাঁচদিন।

—হুঁ, এখন খুব কড়াকড়ি! সেদিন সকালের অ্যাডভেঞ্চারের পর—

—তাতে কিছু যায় আসে না। আমি ফ্ল্যাট খুঁজছি, শিগগিরই বোধ হয় একটা পেয়ে যাবো। রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দিয়ে দিয়েছি।

—বাঃ, ব্যবস্থা একেবারে পাকা! কিন্তু পাত্রীকেই যদি না পাওয়া যায়—

—শেষ পর্যন্ত কি আটকে রাখতে পারবে? জয়শ্রী ঠিক চলে আসবে—

একটু বাদে শান্তনু বললো, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পড়েছে, চলো কোথাও বসে একটু চা খাওয়া যাক।

—না, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আজ আর না।

—কি আর দেরি হয়েছে। আর একটু থাকো না। মনটা ভালো লাগছে না। জয়শ্রীর সঙ্গে দেখা হয় না। তোমার সঙ্গে কথা বললেও ভালো লাগে।

—মধুর অভাবে গুড়?

—যাঃ, ওরকম ভাবে বলছো কেন? তুমি আলাদা, জয়শ্রী আলাদা। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার এমনি বন্ধুত্ব থাকতে পারে না?

—দোকানে নয়! তা হলে আমাদের বাড়িতে চলুন। বাড়িতে চা খাওয়াবো।

শান্তনু একটু চিন্তিতভাবে বললো, তোমাদের বাড়ি যাবো? কারুর বাড়ি যাওয়ার পক্ষে একটু বেশি রাত হয়ে যায় নি?

—না, না, আমার বাড়িতে সে রকম কিছু নেই। বেশি দূর নয়—

—আজ থাক। কিংবা চলো, তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি, আজ আর চা খাবো না।

কিছু দূর এগিয়ে শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, তোমার সম্পর্কে একটা ব্যাপার বুঝতে পারি না। তোমাকে কি রকম যেন রহস্যময় মনে হয়!

—রহস্য আবার কি ?

—তোমার নিজের কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু নেই ?

—থাকবে না কেন, অনেক আছে—

—সেরকম বন্ধুর কথা বলছি না। মানে, তুমি কাউকে কখনো ভালোবাসো নি ?

—না।

—কেন ?

—সেরকম কারুকে দেখিনি।

—বিশ্বাস হয় না।

—বিশ্বাস না করলে আর কি করা যাবে—

—সত্যি করে বলো তো, সেরকম কারুকে দেখোনি, না যাদের দেখেছো তাদের কারুকেই তোমার পছন্দ হয়নি ?

—কঠিন প্রশ্ন।

—যদি কোনো ছেলে তোমাকে এসে খুব আন্তরিকভাবে বলে, সে তোমাকে ভালোবাসে, তা হলে তুমি কি করবে ?

—আপনি যেরকমভাবে জয়শ্রীকে বলেছেন ?

—হ্যাঁ, মানে ধরো আমার থেকেও অনেক ভালো কোনো ছেলে !

অনুরাধা ফুরফুর করে হেসে বললো, আপনি কি আমার বিয়ের সম্বন্ধ করছেন নাকি ?

—অনুরাধা, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো কেন ?

—আপনি কেন জিজ্ঞেস করছেন আগে বলুন ?

—এমনিই। আমার জানতে ইচ্ছে করে—

—আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করবো।

কথাটার মধ্যে এমন জোর ছিল যে, তারপর দু-এক মিনিট থমকে যেতে হয়। তারপর শান্তনু বললো, তুমি খুব অহংকারী, না ?

—হ্যাঁ, এই একটাই আমার অহংকার। আমি কারুকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো কেউ সেরকম আসেনি।

—কে আর সাধ করে দুঃখ পেতে আসবে বলো !

—আপনি আর জয়শ্রীই পৃথিবীর শেষ প্রেমিক-প্রেমিকা ! আপনাদের মধ্যেই সত্যিকারের ভালোবাসার টান দেখছি, এছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ কারুকে ভালোবাসে না। ভালোবাসার ওপর আমার বিশ্বাস নেই—

—তোমার কথাটা সত্যি হলে মন্দ হতো না। নিজেকে পৃথিবীর শেষ

প্রেমিক ভাবতে ভালোই লাগে। কিন্তু তোমার কথা সত্যি নয়। ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যায়নি। এখনও মানুষ ভালোবাসার জন্য ব্যাকুল। তবে অনেক সময় চিনতে ভুল হয়।

কথা বলতে বলতে ওরা অনুরাধাদের বাড়ির মোড়ের কাছে চলে এসেছে। অনুরাধা বললো, তা হলে বাড়িতে আসবেন না?

—আজ থাক, আর একদিন আসবো।

—আর একদিন তো আসবেনই। জয়শ্রী আর আপনি একসঙ্গে যেদিন নেমন্তন্ন খেতে আসবেন। মাকে আপনাদের কথা সব বলেছি।

আজও দরজার মুখে অঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে, অনুরাধা একবারও তাকালো না তার দিকে। দোতলায় প্রণবেশদাদের ঘরের দরজা খোলা, দরজার দিকে মুখ করে বসে আছে প্রণবেশদা; হাতে বই। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন। অনুরাধা ভ্রূক্ষেপ করলো না, উঠে এলো ওপরে।

অনুরাধার জীবনে একবার একজন রাজকুমার এসেছিল এলাহাবাদে, তখন তার সতেরো বছর বয়েস। আজও অনুরাধা বুঝতে পারে না, সেই লোকটি পাগল ছিল কি না।

বাদল দত্ত অনুরাধার দাদার বন্ধু, অনেক বছর বিলেতে আছে। একবার সে এক মাসের জন্য দেশে ফিরেছিল, এলাহাবাদে গিয়েছিল একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিতে। বাদলকে দেখলে বাঙালী বলে মনে হতো না, ছ' ফিটের কাছাকাছি লম্বা, সেই রকম চওড়া, গায়ের রং পাঠানদের মতন, গালে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অদ্ভুত মানুষ। কখনো বলতো, উঃ কি বিচ্ছিরি গরম! ইচ্ছে করে পরের প্লেনেই বিলেতে ফিরে যাই। এই গরমে কি মানুষ কাজকর্ম করতে পারে। আবার একটু পরেই বলতো, ওদেশ আমার একদম ভালো লাগে না! এখানে একটা মোটামুটি চাকরি পেলেই থেকে যাই। কি হবে আর ফিরে গিয়ে! খাবার টেবিলে বসে বলতো, যাই বলুন মাসিমা, এত মশলা-টশলা দিয়ে রান্না করা মাংস আমার আর একদম ভালো লাগে না। এতে মাংসর আসল স্বাদটাই পাওয়া যায় না। সাহেবরা খেতে জানে বটে। অথচ সেই লোকই পাঁচ ছ'টা কাঁচা লঙ্কা নিয়ে কামড়ে কামড়ে খেয়েছে আর বলেছে, বিলেতে কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায় না। এই একটা আফশোষ!

অতবড় চেহারা নিয়েও লোকটি ভারী ছটফটে। তিন দিন এলাহাবাদে অনুরাধাদের বাড়িতে ছিল। সেই তিন দিন তাদের বাড়ির সবাই ব্যতিব্যস্ত। তখন জুন মাস, এলাহাবাদে সাঙ্ঘাতিক গরম। সেই জন্য বাদলের সর্বক্ষণ অভিযোগ—যেন আকাশের সূর্যের তাপের জন্যও অনুরাধার বাড়ির লোকরাই

দায়ী, কিন্তু দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল চাই, স্নানের জন্য গরম জল চাই। তিনদিন অনুরাধাদের বাড়িতে থাকার জন্য কোনোরকম কৃতজ্ঞতাবোধ প্রকাশ পায়নি তার মধ্যে, কোন উপহার টুপহার দেওয়া তো দূরের কথা—যেন সব কিছুতেই তার অধিকার। কখনো কখনো অনুরাধার ছোট ভাইকে নিয়ে শূন্যে এমন লোফালুফি করতো যে বাড়ির সবাই ভয়ে কাঁটা।

ঐ বিশাল চেহারার মানুষটিকে দেখে ভয় ভয় করতো অনুরাধার। বেশি কাছ কাছি যেত না। অনুরাধা তখন সদ্য স্কার্ট ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করেছে। একটা আধো আলোছায়াময় ভালো লাগার জগৎ তার সামনে খুলে গেছে। মাঝে মাঝেই হঠাৎ মন খারাপ লাগে, হঠাৎ ভীষণ আনন্দ হয়। সামান্য কারণে দুঃখ। অনুরাধার স্পষ্ট মনে আছে সেই সময়টার কথা।

বাদল দত্ত প্রথমেই অনুরাধাকে তুই বলে সম্বোধন করেছিল। অনুরাধাকে দেখে বলেছিল, বাঃ তুই তো বেশ লম্বা হয়ে গেছিস। তোকে তো খালি গায়ে এইটুকু চেহারা দেখেছিলুম, মনে আছে আমাকে?

অনুরাধার মনে নেই। ঐ কথাগুলো পছন্দ হয়নি অনুরাধার। বাদল তাকে বড় জোর ন' দশ বছর বয়েসে দেখেছে, তখন অনুরাধা খালি গায়ে ঘুরবে কেন?

বাবা মায়ের সামনেই বাদল তার কাঁধে হাত রেখে বলেছিল, কত বয়েস তোর? সতেরো? অ্যাঁ? আমি ভেবেছিলাম পনেরো। কি পড়িস?

বাদলের বয়েস তখন সাতাশ আটাশের বেশি নয়, অথচ কথাবার্তা একেবারে ভারিক্কী বুড়োর মতন। তবে অত বছর বিলেতে থেকেও কথা বলতে বলতে ইংরিজী মিশিয়ে ফেলতো না।

প্রথম প্রথম বাদল তাকে পাত্তাই দেয়নি, মাঝে মাঝে শুধু হুকুম করেছে, এটা নিয়ে আয়, ওটা নিয়ে আয়। অনুরাধা সেসব কাজের ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে দূরে দূরে থেকেছে। রাত্তিরবেলা খাবার টেবিলে পলিটিকস নিয়ে দারুণ তর্ক হচ্ছে, দাদা, বাবা আর বাদল একেবারে যুক্তির ঝড় বইয়ে দিয়েছে। হঠাৎ বাদল টেবিলের তলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ করে অনুরাধার একটা হাত চেপে ধরলো। অনুরাধা ভয়ে কাঠ। এরকম অভিজ্ঞতা তার কল্পনার বাইরে। বাদল অনুরাধার দিকে একবারও তাকায়নি, ঠোঁটে একটু হাসির আভাস, তখনও সামনে তর্ক চালিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির সবাইকার সামনে, যে-কোনো মুহূর্তে কেউ দেখে ফেলতে পারে, মা যখন পরিবেশন করতে আসছে—অনুরাধা ভাবতেই পারে না—একজন দৈত্যের মতন চেহারার মানুষ টেবিলের তলা দিয়ে তার হাত শক্ত করে ধরে আছে। দেহত্যাগের আগে সতীর যেমন শ্বাসরুদ্ধ

অবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে বসে রইলো অনুরাধা।

একটা কথাও নয়, শুধু হাত ধরে বসে থাকা। খাওয়ার পরে বাদল তাকে আর কিছু করেনি, অসমাপ্ত তর্ক নিয়ে দাদা-বাবার সঙ্গে চলে গেছে বসবার ঘরে। ভয় কেটে যাবার পর মানুষটা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল হয়েছিল অনুরাধার।

ঘুম থেকে খুব দেরি করে ওঠে বাদল—সাহেবদের দেশে থাকার কোনো চিহ্নই তার মধ্যে দেখা যায় না। সকালবেলা অনুরাধা তাকে চা দিতে গিয়েছিল। একটা অদ্ভুত ধরনের স্লিপিং স্যুট পরে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল বাদল। চায়ের কাপ রাখার শব্দ শুনে মুখ তুলে অনুরাধাকে দেখে হাসলো। তারপর আঙুল নেড়ে বললো, এই শুনে যা, শুনে যা।

অনুরাধা বললো, কি ?

বাদল ছোট ছেলেকে ডাকার ভঙ্গি করে বললো, শুনে যা। কাছে আয়!

অনুরাধা আড়ষ্টভাবে একটু এগিয়ে এসে বললো, কি বলছেন ?

—তুই আমাকে চা দিতে এসেছিস কেন রে ? বাড়িতে আর কেউ নেই ?

লজ্জায় অনুরাধার মুখটা লাল হয়ে গেল। এরকম কথা কেউ জিজ্ঞেস করে ? তবে লোকটা কি ভেবেছে যে, অনুরাধা নিজে ইচ্ছে করে এসেছে ? এসব কথা তো অনুরাধা ভাবেই না!

—কি রে, উত্তর দিচ্ছিস না কেন ? বাড়িতে তো চাকর-বাকর রয়েছে।

—মা আমাকে দিয়ে আসতে বললো।

—মা বললো—এই কথা উচ্চারণ করে বাদলের কি হো হো হাসি। হাসতে হাসতে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো, তোর মা তোকে কেন পাঠিয়েছে জানিস ? নাকি জানিস না ? যদি তোকে আমি পছন্দ করে বিয়ে করে ফেলি—সেই জন্য।

এবার লজ্জার চেয়েও বেশি অপমান! অনুরাধার কান গরম হয়ে গেল। সতেরো বছর বয়েসে আবার বিয়ে কি ?

অনুরাধা ঝাঁজের সঙ্গে বললো, মোটেই না! আপনি এসব যা-তা কথা বলবেন না!

—আরে, চলে যাচ্ছিস কেন ? শোন-শোন, তুই বিলেত যাবি ?

—না।

—আমি কিন্তু সত্যিই বিলেত যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

—আমার দরকার নেই।

—তুই কি ভেবেছিস, সত্যি তোকে বিয়ে করবো নাকি? ইঃ একটা একরত্তি মেয়ে।

অনুরাধার এত রাগ হয়েছিল যে, ইচ্ছে করছিল তক্ষুনি ছুটে গিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। মা কি সত্যিই এরকম কথা ভেবেছে? এই বিশ্রী স্বভাবের লোকটাকে সে মরে গেলেও বিয়ে করবে না।

অনুরাধা মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার সুযোগ পায়নি। সেদিনই দশটা এগারোটার সময় হুলুস্থুলু কাণ্ড বাড়িতে। বাদলের হঠাৎ সাংঘাতিক পেটের ব্যথা শুরু হলো। সে কি পেটের ব্যথা, একেবারে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে। অতবড় চেহারার লোকটাকে দাদা আর বাবা দুজনে মিলেও ধরে রাখতে পারছে না বিছানায়। ছটফটানি আর আর্তনাদ—ইংরেজি বাংলা মেশানো।

তিনজন ডাক্তার এসেও হিমসিম খেয়ে গেল। কিছুতেই সামলানো যায় না। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, সবার ভয় হলো, কিছু একটা হয়ে টয়ে না যায়। দূর বিলেত থেকে তিন দিনের জন্য এলাহাবাদে এসে ওরকম একটা স্বাস্থ্যবান মানুষের যদি হঠাৎ একটা খারাপ কিছু হয়ে যায় তাহলে তাদের বাড়ির লোকের মনের অবস্থা কি হবে? কিছু থেকে ফুড পয়জনিং হয়ে গেল? অথচ সকালে তো সে চা ডিম টোস্ট ছাড়া কিছুই খায়নি—বাড়ির অন্য সবাই তাই খেয়েছে।

ব্যথার ছটফটানির সঙ্গে এমন চ্যাঁচামেচি করছে বাদল যে ভিড় জমে গেল তাদের বাড়ির সামনে। দেখতে দেখতে তার জ্বরও বেড়ে যাচ্ছে খুব। শেষ পর্যন্ত জোর করে অনেকে মিলে তাকে চেপে ধরে পেথিড্রিন ইঞ্জেকশন দিয়ে অজ্ঞান করে দেওয়া হলো। অতবড় শরীর পেথিড্রিনেও কাবু হতে চায় না। তবু আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়লো।

সন্ধ্যে নাগাদ ধরা পড়লো যে, তার কিডনিতে পাথর হয়েছে, সেই ব্যথা। অনেক সময় এই ব্যথা খুবই মারাত্মক হয়। রাত আটটার সময় চোখ মেলে বাদল রীতিমত হাসিমুখে বললো, বছর খানেক আগেও তার এরকম ব্যথা একবার হয়েছিল। অপারেশনটা করানো হয়নি, এবার বোধ হয় করাতে হবে। অত তো চিন্তার কিছু ছিল না, আরো আগে তাকে অজ্ঞান করে দিলেই তো হতো।

বাড়ির সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো বটে, বিরক্তও কম হলো না। বাদল পরদিনই চলে যাবার প্রস্তাব করায় আপত্তি করলো না কেউ। বাদলের অবশ্য শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যেবেলা সে প্লেনে দিল্লী

চলে যাবে। হাসপাতাল সম্পর্কে তার ভয় আছে, হাসপাতালে যদি ভর্তি হতেই হয়, তবে এলাহাবাদের বদলে দিল্লীতে—কারণ সেখানে তার চেনা ডাক্তার আছে, পকেট ভর্তি পাউণ্ডের নোট আছে। ইণ্টারভিউ দেওয়া আর হলো না তার। হয়তো বিলাতে ফিরে গিয়েই অপারেশন করাবে।

পরদিন দুপুরে সারা বাড়ি নির্জন, বাবা অফিসে গেছে, দাদাও বেরিয়েছে কোথায়, মা ঘুমিয়ে! অনুরাধা রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে তার এক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল, বাদল তাকে ডাকলো। বাদলকে দেওয়া হয়েছে বাইরের দিকের ঘরখানা, শুয়ে শুয়ে সে জানলা দিয়ে রাস্তা দেখে।

আজ একটু নরমভাবে বাদল অনুরাধাকে ডেকে বললো, এই, শুনে যা!

লোকটিকে পছন্দ করে না অনুরাধা, কিন্তু অভদ্র ব্যবহারও করতে পারে না। বাইরে জানলার কাছে এসে বললো, কি?

—ভেতরে আয়, তোর সঙ্গে একটু গল্প করি।

—আমি একটা দরকারে যাচ্ছি।

—এখন কোনো দরকারে যেতে হবে না। আমার কাছে এসে একটু বোস।

—সত্যি, আমার একটা কাজ আছে। আচ্ছা, ঘুরে আসি আগে।

একটু পরে যাবি। আমাকে এক গ্লাস জল দিয়ে যা তো।

কেউ জল চাইলে প্রত্যাখ্যান করার নিয়ম নেই। এমন কি বিনা প্রয়োজনে চাইলেও। অনুরাধা কাচের গেলাসে এক গ্লাস জল নিয়ে গেল, বাদল কিন্তু ঢকঢক করে সবটাই খেয়ে ফেললো। বললো, আঃ, বেশ ঠাণ্ডা তো, আর এক গ্লাস দে তো—

এর আগে অনুরাধা তাকে খুবই কম জল খেতে দেখেছে। এখন সে পর পর তিন গেলাস জল খেয়ে ফেলে বললো, কিডনির ব্যাপার তো! বেশী জল খেতে হয়! আধঘণ্টা বাদে আমার আবার জল লাগবে, তখন কে দেবে?

অনুরাধা বললো, আমি আপনার এখানে একটা জগ রেখে যাচ্ছি!

—না, তুই একটু বোস। কাল সারাদিন ঘুমিয়েছি তো, আজ আর ঘুম পাচ্ছে না। তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে ইচ্ছে করছে। এখানে বোস না—

বাদল একটু সরে গিয়ে তার বিছানায় জায়গা করে দিল। অনুরাধা সেখানে বসলো না, কিন্তু এরকমভাবে বললে চলেও যাওয়া যায় না। বসলো একটা চেয়ার টেনে। একদিন অসুখেই বাদলের মুখের চেহারাটা বদলে গেছে। কর্কশ ভাব আর নেই, খানিকটা ম্লান। অনুরাধা আজ ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো, রুক্ষতার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও লোকটি সত্যিই সুপুরুষ। এত বড় চেহারা, তবু একটা ছেলেমানুষের ভাব আছে।

বাদল জিজ্ঞেস করলো, তোর ভালো নাম কি রে? খালি ভুলে যাই। অনুরাধা? অনুরাধা মানে কি? যাই মানে হোক, এ নামটা তোর চেহারার সঙ্গে মানায় না। নামটার মধ্যে কি রকম একটা শান্ত শান্ত ভাব আছে।

—আমি কি অশান্ত নাকি?

বাদল দুই বিরাট চোখ মেলে অনুরাধার দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে রইলো চুপ করে। ওই রকম তাকানো দেখলে অনুরাধার গা ছমছম করে। সাধারণ মানুষ তো এ ভাবে তাকায় না।

বাদল গলার স্বর একেবারে বদলে ফেলে খুব আন্তরিকভাবে বললো, তুই ভবি সুন্দর। তোর সৌন্দর্যের মধ্যে একটা তেজের ভাব আছে। এইটা আমার ভালো লাগে। সত্যি, তুই খুব সুন্দর, তোকে এ বাড়িতে মানায় না—

অনুরাধা মুখ নীচু রইলো।

বাদল আবার জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, আমি যে তোকে খুব সুন্দর বললুম, এতে তোর কি রকম লাগছে? তোকে এভাবে আগে আর কেউ বলেছে?

অনুরাধা এবারও কোন উত্তর দিতে পারলো না। পুরুষের স্তুতির মধ্যে যে এরকম একটা সম্মোহনের মতন ভাব আছে, সে জানতো না। তার সতেরো বছরের শরীরটা একটু একটু কাঁপছে। সত্যিই তো, এরকম ভাবে তো তাকে আগে কেউ বলেনি।

বাদল বললো, নাকের ডগাটা একটু ওপরের দিকে তোলা—ওতে একটা তেজের ভাব ফোটে। খুব কম মেয়ের থাকে ওরকম। মাথায় এতখানি চুল মেমসাহেবরা দেখলে হিংসেয় মরে যাবে। মুখে চোখে একটা ঝকঝকে ভাব, বোঝাই যায়—গায়ের চামড়াটা খুব মসৃণ—

বাদলদা, আমি এবার যাই—

কোথায়? আমার কাছে বসতে তোর ইচ্ছে করছে না?

—না, তা নয়—

—তুই অত দূরে বসেছিস কেন? তোকে আমার খুব আদর করতে ইচ্ছে করছে—

অনুরাধাকে আর কোনো সুযোগ না দিয়েই বাদল হুড়মুড় করে উঠে পড়লো খাট থেকে। অসুস্থ সেই বিশাল পুরুষটি অনায়াসে অনুরাধাকে কোলে করে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল খাটের ওপর। কোনো অপমান করলো না। হুকুমের সুরে বললো, চুপ করে বসে থাকো এখানে, একদম নড়বে না।

দারুণ ভয় পেয়েছে অনুরাধা, চিৎকার করারও সাহস নেই। ঢক ঢক করে আর এক গেলাস জল খেয়ে ধপাং করে আবার শুয়ে পড়লো খাটে। সমস্ত

খাটটা যন্ত্রণায় শব্দ করে উঠলো। অনুরাধার দিকে ফিরে বললো, এবার বলো—

—কি বলবো ?

—ও হ্যাঁ, তুমি তো কিছু বলবে না। চুপটি করে বসে থাকো, কিচ্ছু বলবে না, আমি তোমাকে আদর করবো—

অনুরাধার গালে আলতো করে হাত ছুঁইয়ে বললো, আঃ কি নরম, কি নরম, ভারী সুন্দর—

অনুরাধার গলার কাছে কান্নার মতন কি যেন একটা আটকে গেছে। অসহায়ভাবে বললো, বাদলদা, কি বলছেন ?

—চুপ, কথা বলবে না।

আরও কাছে সরে এসে অনুরাধার পিঠে নাক ছুঁইয়ে বললো, আঃ, কি সুন্দর তোমার গায়ের গন্ধ। শুধু বাঙালী মেয়ের গায়েই এরকম গন্ধ পাওয়া যায়—বৃষ্টির পর তুলসী গাছে যেরকম গন্ধ হয় বুঝলে অনুরাধা, মেমসাহেবদের গায়ে না বদখৎ গন্ধ একেবারে- অনেকটা বেড়াল বেড়াল ভাব—

অনুরাধা তখন উঠে পড়ার চেষ্টা করছে কিন্তু পারলো না, বাদল তাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরেছে। উন্মাদের মতন একজন শক্তিশালী মানুষ তার সারা গায়ের গন্ধ শুঁকছে। অনুরাধার মনের একটা অংশ ভয় পেয়েছে, চাইছে যে-কোনো ভাবে হাত ছাড়িয়ে পালাতে ; আর একটা অংশে অসহ্য ভালো লাগা —তার শরীরটা চুম্বকের ধর্ম পেয়ে গেছে।

অনুরাধার সেই সতেরো বছরের স্বচ্ছ যৌবনে প্রথম একটি পুরুষের স্পর্শ। ভয়, লজ্জা, ভালো লাগা—সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত অবস্থা। ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করার ব্যাপারে বাদলের কোন চিন্তা নেই—যেন এ সবই খুব স্বাভাবিক ব্যাপার -এইভাবে সে সেই নিস্তব্ধ দুপুরে অনুরাধার কম্পিত বুকে মুখ চেপে রেখে গরম নিঃশ্বাস ফেলছে।

খানিকটা বাদে বাদল অনুরাধাকে ছেড়ে চিং হয়ে শুয়ে রইলো। কড়ি-কাঠের দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করলো, আঃ, বড্ড ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে, আমার সব ব্যথা-ট্যথা সেরে গেছে ! তুই এত সুন্দর রে টুকু, সুন্দর জিনিসের ছোঁয়া লাগলে সব অসুখ সেরে যায়।

তারপর আবার অনুরাধার দিকে ফিরে বললো, মনে করিস না আমি খারাপ লোক। আমাকে তুই খারাপ ভাবছিস ?

অনুরাধা উত্তর দিল না। তার শরীর তখনো থরথর করে কাঁপছে।

বাদল তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, কি, উত্তর দিচ্ছিস না যে ?

শোন, আমি আজ সন্ধ্যের পর দিল্লী যাচ্ছি, যেতেই হবে, আমার খুব কাজ আছে। আমি আবার দিন দশেক বাদে ফিরে আসবো! আমি তোকে চাই। তুই আমার সঙ্গে যাবি তো? বিয়েটা খুব তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কি যাবি তো?

অনুরাধা নির্বাক।

—দিন দশেকের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি। এসে তোর বাবাকে বলবো। দিল্লী থেকে চিঠি লিখবো তোকে। তুই উত্তর দিবি তো? কি বল, উত্তর দিবি না? ওসব লজ্জা-ফজ্জার কোনো মানে হয় না। আমি তোকে চাই। তোর গায়ে আর কেউ হাত ছোঁয়াবে—এ আমি সহ্য করতে পারবো না। কি, চিঠির উত্তর দিবি তো?

—দেবো—

—ঠিক? আমি গিয়েই তোকে—

বাদল অবশ্য কোনো চিঠি লেখেনি। দিল্লীতে দিন সাতেক থেকে সে কলকাতায় চলে যায়, সেখানেও একটা চাকরির ইণ্টারভিউ দিয়েছিল কিন্তু মাইনে পছন্দ হয়নি। অগত্যা ফিরে গেল বিলেতে। অনুরাধা আশা করেছিল, বিলেত, থেকে সে অন্তত কিছু লিখবে। তাও লেখেনি। বছর খানেক বাদে প্যারিস থেকে একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল তার দাদার কাছে, তাতে অনুরাধাব নাম গন্ধও ছিল না। তবে লিখেছিল, তখনও সে অপারেশন করায়নি, আরও দু'বার পেটের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে। সেই কষ্টের সময় সে কোন সুন্দবের সাহচর্যে সান্ত্বনা পেয়েছে কে জানে।

অনুরাধা অনেকদিন তার ছেলেমানুষী আশা নিয়ে বাদলের চিঠির আশা করেছিল। এখন আর করে না। বাড়িতে এখনো কোনো সময় বাদলের প্রসঙ্গ উঠলেই সবাই বলে, ও ছেলেটা একেবারে পাগল! এ কি ধরনের পাগলামি, অনুরাধা বুঝতে পারেনি কখনো!

এখন অনুরাধা জানে বাদল তাকে কোনোদিন ভালোবাসে নি। শুধু লোভ। ইংরাজী গল্প উপন্যাসে যাকে বলে অ্যাফেয়ার, বাদল এলাহাবাদে এসে সেই রকম একটা অ্যাফেয়ার করে গেছে। তার বেশী কিছু নয়। ভালোবাসে নি। ভালোবাসার ওপর তার বিশ্বাস নেই।

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে অনুরাধার হঠাৎ চোখে জল এসে গেল। অনুরাধা এখন অনেক শক্ত হয়েছে। বহুদিন সে কাঁদে না। রাত্রির অন্ধকার ছাড়া তার চোখের জল কেউ দেখবে না।

তার জীবনে এই ভালোবাসার অভাবও যে একটা বিরাট বোঝার মতন,

অনুরাধা আজ সেটা প্রথম টের পেল। বাবা-মা-ভাই-বোন, সবাই তো তাকে ভালোবাসে, তবু এক দারুণ নিঃসঙ্গতা। সে নিজেও তো কারুকে ভালোবাসতে পারেনি—যাদের দেখেছে সবাইকে কিরকম যেন ছোট মনে হয় তার তুলনায়। ভালোবাসা জিনিসটা কি? শরীরের আকর্ষণ ছাড়াও নিশ্চয়ই আরও কিছু, কিন্তু সেই আরও কিছুর সন্ধান অনুরাধাকে কেউ দেয়নি এ পর্যন্ত।

চোখের জল মুছে ফেললো অনুরাধা। আলো জ্বেলে বই পড়তে শুরু করলো আবার। বইয়ের জগতে এখনো মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। বিশুদ্ধ প্রেমের জন্য কত নায়ক-নায়িকা জীবনটা নষ্ট করে ফেলে। বেশ লাগে পড়তে এসব। এসব প্রেমের উপন্যাস যেন অনুরাধার কাছে উত্তর মেরুর ভ্রমণ কাহিনী।

॥ ৯ ॥

"কঙ্কন বাজে কিনিকিনি
রাই কিনি কি শ্যাম কিনি? ."

জয়শ্রী, দুদিন আমি অফিসে যাইনি। শুধু তাই নয়, বাড়ি থেকেও বার হইনি একবারও। না, না, আমার অসুখ করেনি। এমনিই। মনে হচ্ছিল, সম্পূর্ণ একা থাকলে, তোমাকে সব সময় কাছে পাবো।

তুমি এ চিঠি পড়বে তোমার নির্জন ঘরে। নিশ্চয় দরজা-জানলা বন্ধ করে নেবে, যাতে তোমার মা না দেখে ফেলেন। তখন সেই নির্জন ঘরে আমি তোমার খুব কাছাকাছি থাকবো, এই চিঠির মধ্যে থেকে ফিসফিস করে কথা বলবো তোমার সঙ্গে। আমি তোমার (এই কথা দুটো লিখে আবার কেটে দেওয়া।)

এই দুদিন একজনও মানুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। সকালবেলা আমার ঘরের কাজ-টাজ করে যে লোকটা সে এসে ঘর পরিষ্কার করে গেছে, আমি তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। কাল সন্ধ্যেবেলা কেউ আমার দরজায় কয়েকবার দুমদুম করে ধাক্কা দিয়েছিল। আমি খুলিনি। বুঝতেই পেরেছিলাম তুমি বা অনুরাধা নয়। মেয়েরা অত জোরে ধাক্কা দেয় না। আমার কোনো বন্ধুটন্ধু হবে। কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করেনি। আজ আর আসেনি কেউ।

ভারি অদ্ভুত কাটলো এই দুটো দিন। এরকম ভাবে আর সম্পূর্ণ একা।

কখনো থাকিনি। তবে সময় কাটাবার কোনো সমস্যা হয়নি আমার। মাঝে মাঝে বই পড়বার চেষ্টা করেছি, তাতেও মন বসেনি খুব একটা। কিন্তু তুমি তো সর্বক্ষণ ছিলে আমার পাশে, তোমার সঙ্গেই কথা বলেছি শুধু। তুমি টের পাওনি? একবারও জিভ কামড়ে ফেলনি?

কেন এইরকম একা থাকলাম জানো? শুনলে তুমি বোধ হয় হাসবে। তোমাকে এখন বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই আমি ভাবলাম, আমিও বাড়িতে বন্দীর মতন থেকে দেখি। তবে, নিজের ইচ্ছেতে থাকা আর অনিচ্ছেয় থাকার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। তাছাড়া তুমি তো সম্পূর্ণ একা নও, বাড়িতে আরও লোকজন আছে। আমি লক্ষ্য করলাম, একা থাকলে বেশ ঘন ঘন খিদে পায়। দুদিনই আমি খিচুড়ি বেঁধেছিলাম, সেই সঙ্গে ডিম ভাজা। নিজের রান্না বলে বলছি না, সত্যিই বেশ ভালো হয়েছিল। তোমাকে একদিন খাওয়াবো। তুমি রান্না জানো?

সেদিন সকালে যেমন এসেছিলে, সেই রকম আর একবার চলে আসতে পারো না? সেদিনকার সকালের কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এখনও আমার ঘরের চেয়ারে তোমার স্পর্শ লেগে আছে। আয়নার দিকে তাকালেও যেন তোমার মুখখানা দেখতে পাই। আজ দাড়ি কামাবার সময় খুব মনে পড়ছিল।

একটা জিনিস বুঝতে পারছি, এরকম ভাবে দিন কাটানোর কোনো মানে হয় না। আমাকে কিছু করতে হবে। নতুন করে পড়াশুনা শুরু করবো ভাবছি। কিন্তু তুমি না এলে কিচ্ছু হবে না। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগে আমার মনটা সুস্থ হবে না কিছুতেই।

দু একটা কাজের কথা বলি। দু তিনটে ফ্ল্যাট দেখেছি। তার মধ্যে যোধপুর পার্কের একটা ফ্ল্যাট বেশ ভালোই। কিন্তু তুমি একবার দেখবে না। তোমাকে না দেখিয়ে ফ্যাইন্যাল করতে পারছি না। আর একটা মজার ব্যাপার কি জানো, অনেক বাড়িতেই ব্যাচিলার শুনলে ভাড়া দিতে চায় না।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে ফর্মটা জমা দিয়েছি। আগামী মাসের আট তারিখে এক মাস পূর্ণ হবে। মনে রেখো। অর্থাৎ আর কুড়ি দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে কিন্তু।

কয়েকদিন আগে অনুরাধার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তোমাকে বলেছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, অনুরাধার ব্যাপারটা কি বলো তো? ও সব সময়ই এত চাপা থাকে যে ওকে ঠিক বোঝা যায় না। ওর যেন কি একটা হিস্ট্রি আছে।

তোমরা দুজনে এত বন্ধু কিন্তু দুজনে একেবারে আলাদা। আমার মনে হয় (লিখে কেটে দেওয়া)।

চিঠির উত্তর কালকের মধ্যেই চাই। বাড়ি দেখতে যাওয়া হবে কি করে, জানিয়ো।

কেমন আছো, জয়শ্রী, বার বার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, কেমন আছো ? তুমি ভাল আছো তো ? তোমাকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে না তো ?

ইতি —

শান্তনু

জয়শ্রী খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, অনুরাধা হেলান দিয়ে বসে আছে। এই নিয়ে দুবার পড়া হলো চিঠিটা।

অনুরাধা হাসতে হাসতে বললো, এই তোকে না লিখেছে, দরজা বন্ধ করে একা একা চিঠিটা পড়তে। তুই আমাকে পড়াচ্ছিস।

জয়শ্রী উত্তর না দিয়ে হাসলো। তারপর বললো, ওর এরকম ধারণা কেন হলো বল তো যে, আমাকে বাড়িতে আটকে রেখেছে ? এর মধ্যে দুটো সিনেমা দেখলাম, কাল মার্কেটে গিয়েছিলাম —

- ছেলেদের ও রকম ভালো লাগে। বেশ একটা বন্দিনী রাজকন্যা রাজকন্যা ভাব, ও এসে তোকে উদ্ধার করবে, বেশ রূপকথার মতন —

— আমার বাবা-মা মোটেই আমাকে আটকে রাখে না।

— তুই তাহলে ওর সঙ্গে দেখা করিস না কেন ! বেচারা একেবারে ছটফট করছে।

— সঙ্গে যে সব সময় কেউ না কেউ থাকে — তাও ম্যানেজ করা যায়। তবে আমি খানিকটা ইচ্ছে করেই দেখা করছি না।

— কেন ?

— রোজ দেখা হলে কি ও এরকম চিঠি লিখতো ? ভারি সুন্দর চিঠি লেখে, না রে ? কোনোরকম ফাজলামি নেই —

— ইস, খুব যে গর্ব !

— দ্যাখ ভাই, আমি আগেও ছেলেদের কাছ থেকে অনেক চিঠি পেয়েছি। একজন তো কবিতা টবিতা লিখতো—কিন্তু কেউ এরকম সুন্দর চিঠি লেখেনি। বেশির ভাগই এমন অসভ্যর মতন লেখে —

— তুই আগেও অনেক প্রেম করেছিস বুঝি ?

—আমার ভাই ছেলেবেলা থেকেই প্রেমে পড়া স্বভাব।

কথাটা বলেই জয়শ্রী এমনভাবে হাসতে লাগলো যে অনুরাধাও না হেসে

পারলো না। হাসির সময় জয়শ্রীর সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। হাসি থামিয়ে বললো, সত্যি ঠাট্টা নয় কিন্তু! স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় আমি একটা ছেলের এমন প্রেমে পড়েছিলুম যে মনে হয়েছিল, তাকে না পেলে আমি মরেই যাবো। একটা বিয়েবাড়িতে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—খুব সুইট দেখতে—। আমি ঠিক করেছিলুম, ওকে না পেলে আমি আত্মহত্যা করবো—

—তারপর আত্মহত্যাটা বন্ধ হলো কিসে?

ওর বাবা ট্রান্সফার হয়ে গেল কানপুরে, সেখান থেকে চিঠি লিখতো। প্রথম প্রথম আমি দু একটা উত্তর দিতাম – তারপর জানিস তো, আমার ব্যাপার, চিঠি লেখার কথা ভাবলেই জ্বর আসে—আস্তে আস্তে থেমে গেল।

—প্রেমে পড়লে কি রকম লাগে রে?

—আহা-হা, তুই বুঝি জানিস না!

—সত্যি জানি না।

—যেদিন পড়বি, সেদিন বুঝবি! তুই প্রেমে পড়লে একেবারে হাবুডুবু খাবি বুঝতে পারছি।

—কেন?

—কম বয়েস থেকে একটু প্রেমে পড়ার প্র্যাকটিস থাকা ভালো – নইলে ঐ রকমই হয়।

—তোর তো প্র্যাকটিস আছে। তুই বুঝি শান্তনুর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিস না?

—শান্তনুর কথা আলাদা। শান্তনুর মতন আর একটা ছেলে তুই খুঁজে বার করতো।

—প্রেমে পড়লে ঐ রকমই হয় বুঝতে পারছি। শান্তনু এমন কিছু অসাধারণ ছেলে নয়!

—ইস্! দেখবো, তুই যার প্রেমে পড়বি, তাকেও তো দেখবো! এই অনুবাধা, চিঠি লিখে দে ভাই। কালকেই উত্তর দিতে বলেছে –

—বা বা! আমি তোর সব চিঠিই লিখে দেবো নাকি? এটা তুই লেখ!

প্লিজ দে, ওরকম করিস না! আমি একদম গুছিয়ে লিখতে পারি না!

—বিয়ের পর কি করবি? তখন তো আমি গিয়ে লিখে দেবো না।

—বিয়ের পর চিঠি লেখার দরকার হয় না।

—মনে কর শান্তনু কোথাও বাইরে গেল, কিংবা তুই—

—সে তখন দু'চার লাইন ঠিক লিখতে পারবো। বিয়ে হয়ে গেলে তো কেউ আর প্রেমপত্র লেখে না।

—বিয়ে হয়ে গেলেই প্রেম শেষ ?

—কি জানি বাবা, অত শত জানি না। তুই লেখ তো!

—কি লিখবো! তুই বরং বলে যা আমি লিখে যাচ্ছি।

—আমি আবার বলবো কি ? ওর চিঠিটা ধরে ধরে তুই উত্তর লিখে দে। তুই বেশ ভালো পারিস ওসব! আমি কপি করে দেবো এখন পরে। হয়তো দেখবি, এমনই কপাল তোর যে প্রেমে পড়বে সে হয়তো চিঠি লিখতে জানে না।

—তখন তার চিঠি আবার আর একজন লিখবে ?

দুই সখী আবার এ ওর দিকে ঢলে পড়ে হাসতে লাগলো। তিনতলাটা একেবারে নির্জন, আর কেউ নেই। গোটা তিনেক শালিক ছাদের কার্নিসে বসে তখন থেকে ঝগড়া করে যাচ্ছে, আর এই মেয়ে দুটির হাসি।

জয়শ্রী গরজ করে কাগজ আর প্যাড এনে দিল। অনুরাধা থুতনিতে আঙুল ঠেকিয়ে ভাবতে বসলো। জয়শ্রী বললো, বাড়ি দেখার ব্যাপারটা লিখে দে, পরশু যোধপুর পার্কে আমার মাসিমার বাড়িতে—

শান্তনুর চিঠিখানা তুলে নিয়ে আর একবার পড়লো। ভুরু কুঁচকে গেল তার। পরমুহূর্তেই হাসি ফুটিয়ে বললো, লিখে দেবো তুই এ ক'দিন সত্যিই বাড়িতে বন্দী নেই, দিব্যি সিনেমা দেখে বেড়াচ্ছিস!

—ওটা আর বলতে হবে না।

অনুরাধা বললো, এবার আর কি নতুন রকম এ্যাড্রেস করা যায় বল তো ? প্রাণবল্লভ কিংবা হৃদয়েশ্বর লিখবো ?

—ধ্যাৎ।

—কিংবা একটু আধুনিক করে, ওগো, আমার হৃদয় গহনে একমাত্র পথিক!

—কি হচ্ছে কি!

এইভাবে হাস্য পরিহাসে আরও কিছুটা সময় যায়। দুই স্বচ্ছমনা যুবতী বিমল কৌতুক উপভোগ করে।

জয়শ্রী বললো, এই তাড়াতাড়ি লেখ। মা এসে পড়বে এর পর। সিম্পলভাবে ছোট করে লিখে দে। বেশি বড় হলে আমি কপি করতে পারবো না! তোর ঐ দুবার নাম ধরে ডাকাটা বেশ, ঐ রকমই লেখ!

অনুরাধা বললো, সম্বোধনটা কি হবে, সে তুই পরে বসিয়ে নিস। তোর যা ইচ্ছে—

অনুরাধা লিখতে শুরু করলো। মাঝে মাঝে থেমে ওর কলম কামড়াতে হলো না, বেশ সাবলীলভাবেই লিখে যায়। জয়শ্রীকে বললো, লেখার

মাঝখানে কিছু বলবি না কিন্তু।

শান্তনু,

সাত আট দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু মনে মনে তোমাকে সব সময় দেখতে পেয়েছি। আজ তোমার চিঠি পেয়ে তোমার কথাও শুনতে পেলাম। তুমি যেন ফিসফিস করে আমার কানে কানে কথা বলছো। তুমি এত সুন্দর চিঠি লেখো, আমি তোমার মতন কিছুই পারি না। তুমি সব দিক থেকেই আমার থেকে এত বড। তুমি আমাকে রোজ এরকম একটা করে চিঠি লিখতে পারো না?

(জয়শ্রী: এই, রোজ চিঠি লিখলে আমাকেও রোজ উত্তর দিতে হবে নাকি?)

তুমি রোজ চিঠি লিখবে। আমি কিন্তু উত্তর দিতে পারবো না রোজ, আমার অনেক অসুবিধে। তবে আমি মনে মনে তোমাকে উত্তব পাঠাবো। তুমি শুনতে পাবে না?

এই শোনো, তুমি ওরকম পাগলামি করবে না। পুরো দুদিন ধরে ঘরে বন্দী হয়ে থাকা আবার কি? ওতে কক্ষনো স্বাস্থ্য ভালো থাকে না। সত্যি করে বলো তো, তোমার আবার জ্বর হয়নি তো? দুদিন ধরে কেউ খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খেতে পারে? খবর্দার, তোমাকে নিজেকে রান্না করতে হবে না। খুব হয়েছে। আমি খিচুড়ি মোটেই ভালোবাসি না। আমি খুব ভালো রান্না জানি, তোমাকে অনেক রকম রেঁধে খাওয়াবো।

(জয়শ্রী: এই, ও কি মিথ্যে কথা লিখছিস। কেটে দে। ও লাইনটা কেটে দে। অনুরাধা মুচকি হেসে কেটে দিয়ে আবার শুরু করলো।)

আমি নিজেও রান্না জানি না। তবে সোনালি সরকার বলে একজন মহিলা খুব ভালো রান্না জানেন। তাঁর বই পড়লে নাকি অতি নভিসও মোগলাই খানা রেঁধে ফেলতে পারে। সুতরাং কোনো অসুবিধে হবে না।

সেদিন সকালবেলা চলে যাবার জন্য মা বেশ বকাবকি করছিলেন। মা বলেছিলেন, তুই যদি ওরকম করিস, তা হলে কবে এসে দেখবি, আমি হার্টফেল করে মরে গেছি। সুতরাং সকালবেলা আর যাওয়া হচ্ছে না। তবে, আর কুড়ি বাইশ দিন আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পারবো। শোনো, মা বোধ হয় রাজী হয়ে যাবেন। মা অনেকটা নরম হয়ে এসেছেন। বাবা অবশ্য কোনো কথা কানেই তুলতে চান না। তবে আমি ঠিক করেছি, রেজিস্ট্রির দিন মাকে বলে যাবো, কিংবা চিঠি লিখে রেখে যাবো। মাকে না জানিয়ে আমি জীবনে কক্ষনো কিছু করিনি, তাই খুব খারাপ লাগে।

(জয়শ্রী : এটা একদম ঠিক লিখেছিস রে !)

পরশু দিন যোধপুর পার্কে সেজ মাসিমার বাড়িতে যাবো। তুমি ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় পোস্ট অফিসের সামনে থেকো। বাড়িটা দেখে আসবো। তবে সেজ মাসিমার বাড়ির খুব কাছাকাছি যদি হয়, তা হলে নেওয়া হবে না। কারুর অত কাছাকাছি থাকতে চাই না।

অনুরাধা এসেছিল এর মধ্যে। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা বলেছে। অনুরাধার মধ্যে রহস্য টহস্য কিছু নেই, এমনিই এলেবেলে মেয়ে। তোমাকে ওর সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে হবে না।

(জয়শ্রী : এই, এই, নিজের সম্পর্কে ও কি লিখলি রে ? কেটে দে ! কেটে দে ! অনুরাধা : না কাটবো না !)

তুমি সাবধানে থেকো। শরীরের যত্ন নিও। একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, মাথার কাছের জানলা খোলা রেখো না। আমি ভালো আছি। তুমি লিখেছো, আমাকে কেউ কষ্ট দিচ্ছে কি না। হ্যাঁ, দিচ্ছে। একজন আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে। তুমি !

ইতি—

তোমার জয়শ্রী

জয়শ্রী অনুরাধাকে জড়িয়ে ধরে বললো, শেষটা কি সুন্দর লিখেছিস রে ! এসব আমার মাথাতেই আসতো না !

নিজের রচনার প্রশংসায় অনুরাধা একটু আরক্ত হয় ! তারপর বললো, দাঁড়া, দাঁড়া এখনো শেষ হয়নি। আমি একটা গল্পের বইতে পড়েছি, অনেকে চিঠি শেষ করার পর একটা জায়গায় গোল দাগ দিয়ে লেখে, এইখানে আমি চুমু খাইয়াছি, তুমিও খাইও !

—ভ্যাট অসভ্য !

অনুরাধার কাছ থেকে চিঠির প্যাডটা কেড়ে নিয়ে জয়শ্রী বললো, দাঁড়া না, বিয়ের পর আমি ওকে সব বলে দেবো। আমি বলে দেবো, এই সব চিঠি তোর লেখা—

—এই না না, বলিস না, খবরদার বলিস না।

—কেন বলবো না ? নিশ্চয় বলবো।

—আমার ভীষণ লজ্জা করবে।

—তোকে লজ্জাতেই তো ফেলতে চাই। দেখবো তখন—

—আমি তাহলে তোর বাড়িতে যাবোই না—

—দেখি, কি রকম না গিয়ে পারিস—

এই সময় অলকা দেবী ঢুকলেন। শান্তনুর চিঠি তখনও বিছানার ওপর ছড়ানো, জয়শ্রী তাড়াতাড়ি তার ওপর একটা বালিশ চাপা দিয়ে দিল। অলকা সেদিকে দেখেও দেখলেন না। মুখখানা গম্ভীর, অনুরাধাকে দেখে কষ্ট করে হাসি ফোটালেন।

ছু একটা টুকিটাকি কথার পর অলকা বললেন, এই তো অনুরাধা রয়েছে, ওর সামনেই বলি। মিঠু, তুই আমার একটা কথা রাখবি ?

জয়শ্রী সচকিত হয়ে বললো, কি ?

—তোর বাবা বলছিল—

—আবার সেই কথা ?

—আগে শোন না! তোর যা খুশি করিস, কিন্তু তোর বাবার মুখ রক্ষার জন্য—এই একটু বসবি, ছুটো কথা বলবি—তোর বাবা চান একজনকে দেখাতে—পরে না হয় আমিই বলে দেব, আমার ছেলে পছন্দ হয়নি।

জয়শ্রী দপ করে জ্বলে উঠলো। রাগলে তার জ্ঞান থাকে না। রীতিমতন চেঁচিয়ে বললো, আমাকে সং সাজাতে চাও ? যাকে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না—তার সামনেও আমাকে এসে বসতে হবে। ন্যাকা ন্যাকা কথা শুনে উত্তর দিতে হবে ?

—আহা, এমনি বাড়িতে লোকজনের সঙ্গে আলাপ হয় না ?

—এটা সে ব্যাপার নয়, তা তুমিও জানো, আমিও জানি।

—আচ্ছা, অনুরাধা, তুমি একটু বুঝিয়ে বলো তো! এর মধ্যে অন্যায় কিছু আছে ?

অনুরাধা দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়লো। এই অবস্থায় তার এখানে থাকা উচিত নয়। অথচ চলেও যেতে পারছে না। মাসিমা বুঝি ভাবছেন, সে-ই জয়শ্রীকে ঐ সব পরামর্শ দিয়েছে। অনুরাধা সারা শরীর মুচড়িয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললো, মাসিমা আমি আর কি বলবো ?

—তুমি একটু বলো না, ওর বাবার মুখ চেয়ে যদি একদিন একটু সময়ের জন্য—

—মাসিমা যাই বলুন, মেয়ে দেখার ব্যাপারটা কেমন যেন আমারও খারাপ লাগে—

জয়শ্রী বাধা দিয়ে বললো, কে আসবে, এবার আবার কে আসবে ?

কে আসবে অলকা সেটা জানেন, কিন্তু সেটা বললেন না—আমতা আমতা করে বললেন, কে যেন, তোর কাকা বলছিল, ছেলেটিই শুধু আসবে। আর কেউ নয়।

—কাকার অফিসের সেই লোক ?

—কি জানি, সে কিনা।

—যেই আসুক, তাকে আমি অপমান করবো তোমাদের সামনে, সেটা ভালো হবে ? মা, একটা কথা জেনে রাখো, আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে. আর কোনো রকম নড়চড় হবে না।

অলকা এগিয়ে এসে জয়শ্রীর পিঠে হাত রাখলেন। নরম গলায় বললেন, শোন, হঠাৎ ওরকম মাথা গরম করিস না। যেটা সারা জীবনের ব্যাপার, সেটা ঝোঁকের মাথায় করতে নেই। বিয়েটা শুধু দুজনের ব্যাপার নয়—দুটো পরিবারের, আত্মীয়স্বজন সকলের—সবাই এসে আনন্দ করবে,—আশীর্বাদ করবে —তা নয়, সবার মনে দুঃখ দিয়ে, আপনজনদের কাঁদিয়ে—

—সবাই অসেবে শুধু একদিনের জন্য। সারা জীবনটা আমাকেই কাটাতে হবে যার সঙ্গে, তাকে আমি পছন্দ করব না তো করবে অন্য লোক ?

—তোর বাবা, আমি, আমরাও কি একদিনের জন্য ?

জয়শ্রীর এবার কান্না এসে গেছে। বেশি রাগ হলেই তার কান্না এসে যায়। চোখে জল টলটল করছে অথচ রাগের তেজ মিলিয়ে যায় নি, মার দিকে তাকিয়ে বললে, মা, তুমি কেন বুঝতে পারছো না ? তোমাকে আমি এতো করে বোঝালুম—

মা আর মেয়ে এখন পরস্পরের প্রতি মগ্ন। এই সুযোগ পেয়ে অনুরাধা আস্তে আস্তে বললো, মাসিমা আমি চলি। কেউ শুনতে পেল কিনা কে জানে, দরজার কাছে গিয়ে অনুরাধা আবার বললো, চললাম জয়শ্রী। তারপর বেরিয়ে গেল। তখন আবার জয়শ্রী তাড়াতাড়ি ছুটে এলো অনুরাধাকে এগিয়ে দিতে।

॥ ১০ ॥

সেই সন্ন্যাসীর কি হইল ?

গাড়ি দু ঘণ্টা লেট, হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করছেন পরেশ আর সুজাতা। পরেশের আসার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু দাদার কথা উপেক্ষা করতে পারেন না এত বয়েসেও। আস-নসোল থেকে হৃষীকেশের গুরুদেব আসবেন।

বেঞ্চে জায়গা পেয়ে বসেছেন দুজনে, কয়েকটা মাছি খুব বিরক্ত করছে। হাত নেড়ে তাড়ালে চলে যায়, আবার ঠিক ফিরে এসে গায়ে বসে। মানুষের শরীরে মাছির কি খাদ্য আছে কে জানে।

সুজাতা বললেন, মিঠুকেও নিয়ে এলে পারতে। ও তো বাড়িতেই বসে আছে।

পরেশ বিরক্তভাবে বললেন, গাড়িতে জায়গা হবে না। গুরুদেবের সঙ্গে আবার দুজন শিষ্য আসবেন শুনেছি।

—ঠিক জায়গা হয়ে যেত। মিঠুকে দেখলে গুরুদেব খুশী হতেন।

—বাড়িতে গিয়ে তো দেখবেনই।

—বাড়িতে দেখা আর স্টেশনে রিসিভ করতে আসা কি এক কথা? গুরুদেব এমনিতে মিঠুকে এত ভালোবাসেন।

—এখন বড় হয়ে গেছে। এখন কি আর মিঠু গুরুদেবের কথা শুনবে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা গুরুদেব টুরুদেব কিচ্ছু মানে না।

—এঁর কথা কিন্তু সত্যিই অগ্রাহ্য করা যায় না। দেখলেই কিরকম মাথা নিচু হয়ে আসে।

—আমার তো আসে না। সেই ছেলেটাকে তুমি দেখেছো?

—কোন ছেলেটা?

—সেই যে মিঠুর প্রফেসার—যার জন্য একেবারে পাগল হয়েছে।

—দেখেছি। তবে আমাদের স্বগতবাবুর সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না।

—কেন?

—দেখতে শুনতে খারাপ নয়, কিন্তু কোন চালচুলো নেই, বাড়ির লোক-জনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, কিরকম যেন বাউণ্ডুলে বাউণ্ডুলে ধরনের।

—তুমি যেসব নভেল-নাটক পড়ো তাতে এরকম ছেলেরাই তো হীরো হয়।

—ওসব নভেল নাটকেই মানায়। মিঠুটা যে এত বোকা, কেউ ভেবেছে! আরে বাবা, প্রেম-ট্রেম সবই ভালো, কিন্তু সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলে ওসব দুদিনেই উড়ে যায়।

পরেশ অকারণে হা-হা করে হেসে স্ত্রীর কথাটা উপভোগ করলেন। সানুরাগ দৃষ্টিতে তাকালেন সুজাতার দিকে। বললেন, এই খাঁটি সত্যি কথাটা তিরিশ বছর বয়েসের আগে ছেলেমেয়েদের মাথায় ঢোকে না। তুমি তো তোমার দাদার এক বন্ধুকে বিয়ে করার জন্য—

—এই, আবার ঐ কথা!

—হওনি! সত্যি করে বলো!

—আহা, তখন আমার কতই বা বয়েস, সতেরো কি আঠারো। তবে লুকিয়ে দেখাটেখা করিনি তো আর।

—করো নি? ঠিক?

—আহা-হা!

—তখন সুযোগ ছিল না। এখনকার দিন হলে ঠিক করতে—

সুজাতা ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, করতামই তো! তোমার থেকে তিনি মোটেই খারাপ ছিলেন না।

—কত মাইনে পায়?

—আমি বুঝি সে খোঁজ রাখতে গেছি।

সুজাতার টাক-মাথা অভিজ্ঞ স্বামী মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। আপন মনে আবার বলেন, সুগতর মতিগতি ঠিক বুঝতে পারি না। একবার মনে হয় নিমরাজী, একবার মনে হয় বিয়েই করবে না সারাজীবন। এদিকে দাদা তো আমার ওপরেই সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ট্রেন আসার শব্দেই প্ল্যাটফর্ম ভিড়ে জমজমাট হয়ে গেল। ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে দুজন চেলাকে নিয়ে নামলেন গুরুদেব। মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ, বেশ বড়সড় চেহারার মানুষ, বয়সটা ঠিক বোঝা যায় না, তবে গায়ে বেশ শক্তি আছে। গেরুয়াধারী, গলায় জবাফুলের মালা। লোকটিকে দেখলে সম্ভ্রমের বদলে ভয় হয়। গুরুদেবের পূর্ব পরিচয় কেউ জানে না, বাংলা-হিন্দী দুটিই সমান বলতে পারেন যদিও, কিন্তু বাঙালী বলে বোঝা যায়। একবার উজ্জয়িনীতে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল হৃষীকেশ আর অলকার।

সুজাতা আর পরেশ এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করলেন, উনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন, আশীর্বাদ করবার জন্য হাতও তুললেন না। পরেশ জিজ্ঞেস করলেন, পথে আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো? গাড়ি এত লেট—

গুরুদেব তখনও নিঃশব্দে জ্বলজ্বলে চোখে তাকিয়ে আছেন পরেশের দিকে। পরেশ একটু ভ্যাবাচাকা হয়ে গেলেন। সুজাতা তাঁর কনুই ধরে টানতেই চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, একজন শিষ্য ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আছে। তবু পরেশের দু'এক মুহূর্ত লাগলো বুঝতে যে গুরুদেব আজ মৌনী!

আশপাশে ছোট্ট ভিড় জমে গেছে। কোথাও যাবার নেই এমন কিছু লোক সকৌতুকে দেখছে দৃশ্যটা। পরেশ শশব্যস্ত হয়ে বললেন, ও বুঝেছি!

গাড়িতে সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসলেন গুরুদেব। বাকিরা সবাই পেছনে। গুরুদেবের দৃষ্টি উদাস। হাওড়া ব্রীজে উঠে গাড়ি যখন গঙ্গা পার হচ্ছে, তখন গুরুদেব পাশ ফিরে প্রণাম করলেন গঙ্গাকে। সুজাতা দেখতে পেলেন গুরুদেবের চোখে জল—এরকম অসম্ভব দৃশ্য সুজাতা কল্পনাই করেননি। আগে যতবারই দেখেছেন, গুরুদেব রীতিমতন রাগী লোক, সবাইকে ধমকে কথা বলেছেন।

একটা মানুষ একটা কথা বলবে না, এটা পরেশের কাছে দারুণ অস্বস্তিকর

ব্যাপার। প্রায়ই ভুলে গিয়ে গুরুদেবকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে ফেলছেন, শুধরে নিচ্ছেন শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে।

দোতলার একটি ঘরে গুরুদেবের আসন পাতা হয়েছিল। হৃষীকেশ ও অলকার কিছু আত্মীয় স্বজন ও শিষ্য এসে জমেছে, সবাই গুরুদেবকে ঘিরে বসলেন অশ্বক্ষুর আকারে। গুরুদেব কথা তো বললেনই না, এমন কি কাগজে লিখে উত্তর দেওয়া কিংবা মাথা হেলানোও বন্ধ। তবু অনেকে অনেক কথা বললো, শুধু তাঁকে শোনাবার জন্যই। পদ্মাসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন গুরু। অন্যের এত কথা শুনেও মুখের সমস্ত পেশী ভাবরেখাবিহীন রাখা কম শক্তির কথা নয়।

ভক্তেরা যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো, গুরু আশীর্বাদও করলেন না কারুকে, যেন তাঁর মনে মনে কথা বলাও নিষেধ, শুধু একটা করে ফুল তুলে দিলেন সবার হাতে। পেছন দিকে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পরেশ ভাবলেন, আজকের দিনটা তাহলে এমনি করেই গেল। আজ আর কোন কথাটথা হবে না। গুরুদেবের একজন চ্যালাকে একবাব কাছে পেয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞেস কবলেন, আচ্ছা, মৌনী থাকার দিন উনি খান টান তো? বেলা সাড়ে বারোটা বেজে যাবার পর পরেশই তাড়া দিয়ে বললো, দাদা, আজ উনি ট্রেন জার্নি করে এসেছেন, আজ এখন ওঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে হয় না?

ভক্তরা একে একে বিদায় নিল। বিরাট শ্বেত পাথরের থালায় সাজিয়ে দেওয়া হলো ফলাহার, একবাটি পায়েস ও একবাটি ক্ষীর। গুরুদেব অত্যন্ত গুরুভোজী, যদিও একবেলাই আহার করেন শুধু।

আজ কোনো খাবার ছুঁয়েও দেখলেন না গুরুদেব, থালার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন একদৃষ্টে। তারপর মুখ তুলে সবাইকে চমকে দিয়ে মুখ খুললেন তিনি। জলদ গম্ভীর স্বরে বললেন, হৃষীকেশ, আর সবাইকে বাইরে যেতে বলো। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

অন্যদের আর কিছু বলতে হলো না, সবাই খানিকটা বিমূঢ়ভাবেই ঠ্যালাঠেলি করে বাইরে চলে গেল। হৃষীকেশ তখন উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন, গুরুদেব আঙুল দিয়ে ইসারা করে বললেন, দরজা বন্ধ করে এসে আমার কাছে বসো।

—এবার বলো, আমাকে ডেকেছো কেন?

—গুরুদেব, আপনি আগে খেয়ে নিন। বিশ্রাম করুন।

—আমার খাওয়ার দরকার নেই। বিশ্রামেরও দরকার নেই। আমি কি পরিশ্রম করছি কিছু যে আমাকে বিশ্রাম করতে হবে।

—কিন্তু না খেলে শরীর রক্ষা হবে কি করে? সামান্যই আয়োজন করেছি—

সাজানো খাদ্যদ্রব্যের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পায়েসের বাটিতে একটা আঙুল ডুবিয়ে সেই আঙুলটা ছোঁয়ালেন জিভে। তারপর আঙুলটা ধুয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

হৃষীকেশ আর্ত গলায় বললেন, একি গুরুদেব, একি করলেন?

সন্ন্যাসী একবার আসন ত্যাগ করলে আর তাঁকে খাওয়ানো যায় না। উনি তাহলে সত্যিই খাবেন না। হৃষীকেশ কিছুই বুঝতে পারছেন না। ব্যাপারটা—অন্য কোনোবার তো এরকম হয় না। এবার কি কোনো ক্রটি হয়েছে?

—আমরা কি দোষ করেছি, যে আপনি খেলেন না?

—কিচ্ছু দোষ হয়নি! ও কথা থাক, অন্য কথা বলো।

—না, আপনি খেলেন না—এ আমি মানবো কি করে? আমাদের ওপরে কেন রাগ করেছেন বলুন!

গুরুর মুখখানা সত্যিই ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে। দৃষ্টি জ্বলজ্বলে, ঠোঁটটা বাঁকানো। তবে খানিকটা বিষন্নভাবে বললেন, একজনের ওপর রাগ হলে অন্যের ওপর অনুরাগ বাড়ে। তোমার ওপরে রাগ হলে আমি অন্য শিষ্যের বাড়িতে যেতাম। সেসব কিছু না! লোকালয়ে এসে আমি আর কিছু খাবো-টাবো না! আমি আজ রাত্তিরেই হরিদ্বার চলে যাবো, তুমি ব্যবস্থা করে দাও। কনখলের আশ্রমেই থাকবো—আর কোনোদিন এদিকে আসবো না।

—কেন? এরকম ঠিক করলেন কেন?

—কেন আসবো সেটা বলতে পারো? আজ থেকে সাঁইত্রিশ বছর আগে আমিও তোমাদের মতন গৃহী ছিলাম। মনের শান্তির জন্য ছেড়ে গিয়েছিলাম সংসার। শান্তি পেয়েছিলামও। তবু কেন আমার দুর্গতি হলো—কেন আবার চ্যালাচামুণ্ডা বানিয়ে সংসারে ফিরে এলাম!

—আপনি তো ফিরে আসেননি। আপনি মাঝে মাঝে আসেন, সংসারীদের সৎপথে থাকার নির্দেশ দিতে।

এ কথায় মনোযোগ না দিয়ে গুরুদেব একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন হৃষীকেশের দিকে। তারপর আসনটা টেনে নিয়ে দেয়ালের কাছে ঠেস দিয়ে বসে খুব ক্লান্তভাবে বললেন, আমি আর বাঁচবো না। আমার আর বেশীদিন নেই।

হৃষীকেশ রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে রইলেন গুরুর দিকে।

তিনি আবার বললেন, তোমায় একটা ঘটনা বলি শোনো। ভগবান বুদ্ধ মৃত্যুর আগে শূকর খেয়েছিলেন, জানো তো? আমার জীবনেও সেই রকম

একটা যোগাযোগ হয়ে গেল। হয়তো এটাই নিয়তির নির্দেশ। আসানসোলে পরিমলের কাছে ছিলাম। তার বাড়ির পেছনেই একটা মেথরের বস্তি। মধ্যরাত্রে শুনি, সেখানে পশুর চিৎকার। মৃত্যু যন্ত্রণায় চেঁচাচ্ছে কোনো পশু। আর সবাই তখন ঘুমিয়ে, আমি সুস্থির থাকতে পারলাম না। পায়ে পায়ে উঠে গেলাম সেই বস্তিতে। দেখি কি, একটা জ্যান্ত শূয়োরকে বস্তার মধ্যে ভরে বাঁশ দিয়ে পেটাচ্ছে দু'তিনজন লোক। আরও অনেক ছেলে বুড়ো মেয়ে সেখানটায় বসে—মুখে চোখে খুব একটা আনন্দের ভাব। বুঝলাম যে ঐ শূয়োরটাকে ওরা পুড়িয়ে খাবে। একদিকে আগুনেরও বন্দোবস্ত হচ্ছে। আমার কি নিষেধ করা উচিত ছিল? হয়তো আমার কথা শুনতো না, তবুও তো আমার বলা উচিত। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। মনে হলো, এ লোকগুলো ভালো করে খেতেই পায় না, আজ আনন্দ করে খাবে—এখানে আমার উপদেশের কি মূল্য আছে? পশু নিধন নিষেধ করে আমি কি ওদের খেতে দিতে পারবো? অবশ্য তখন নিষেধ করারও কোনো মানে নেই—ততক্ষণে শূয়োরটার হাড়গোড় সব ভেঙে ফেলেছে। কী বীভৎস তার চিৎকার। তবু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।

যাই হোক, মেথররা আমাকে খাতির দেখালো সন্ন্যাসীর পোশাক দেখে। বসতে দিল। বসে বসে দেখলাম ওদের আচরণ। তুমি বললে, সংসারী মানুষকে সৎপথে থাকার উপদেশ দেওয়াই আমার কাজ—কিন্তু সংসারী বলতে কি তোমার মতন গুটিকতক বড়লোক চাকুরে? ঐ মেথররা সংসারী নয়? ওদের আমি কি উপদেশ দেবো। এতকাল তো এসব কথা ভাবিনি। তারপর শোনো, ওরা তো সেই শুয়োরটাকে তক্ষুনি আগুনে ঝলসালো। ছাল চামড়া সুদ্ধ। কোনোদিন এ দৃশ্য দেখিনি। সংসারের কত লীলাই দেখিনি। যাক, পোড়ানো হয়ে যাবার পর—সবাই কাড়াকাড়ি করে খেতে লাগলো, কি আনন্দ তখন ওদের চোখে মুখে। একটা যেন উৎসব। বুঝলাম, রোজ এমনটি হয় না। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই ওদের সর্দার মতন একজন লোক আমার সামনে শালপাতায় করে খানিকটা মাংস রেখে গেল।

হৃষীকেশ নির্বাক বিস্ময়ে শুনছেন। তাঁর দৃষ্টি সম্মোহিত মানুষের মতন। গুরুদেব গলা চড়িয়ে বললেন, তখন আমার কি করা উচিত ছিল বলতে পারো? তোমরা অন্নব্যঞ্জন সাজিয়ে দাও, ওরাও তো কম ভক্তিভরে দেয়নি। নিজেদের ভাগের খাবার আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে। তখন কিন্তু আমার ভগবান বুদ্ধের কথা মনে পড়েনি, মনে পড়েছিল ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা। কারণ, প্রথমেই আমার দারুণ ঘেন্না হয়েছিল। আমি ভাবলাম, ত্রৈলঙ্গস্বামী নাকি নিজের গু খেয়ে-

ছিলেন, আর এ তো মানুষের খাদ্য। এক টুকরো মুখে দিলাম, রাখতে পারলাম না, বুঝলে হৃষীকেশ, মুখে রাখতে পারলাম না—তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটু দূরে বমি করে ফেললাম।

গুরুদেবের অসহায় মুখ দেখে হৃষীকেশ তাড়াতাড়ি বললেন, তা তো হবেই! আপনি জীবনে কখনো মাছ-মাংস খাননি!

—আরে আহাম্মক! ত্রৈলঙ্গস্বামীও কি আর রোজ রোজ গু খেতেন! তাহলে আর জিতেন্দ্রিয় কি?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন, কি, এর পরেও আমার উপর ভক্তি শ্রদ্ধা হয়?

—আপনি কি বলছেন গুরুদেব! আপনার মতন অসামান্য মহাপুরুষই এরকম পরীক্ষা করতে পারে। অন্য কোনো সাধু-সন্ন্যাসী কি এরকমভাবে নিজেকে পরীক্ষা করতে যাবে কোনোদিন? আজীবন ব্রহ্মচারী হয়েও আপনি যে ওদের দেওয়া ঐ জিনিস মুখে তুলেছিলেন—

গুরুদেব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো। হঠাৎ তাঁর মুখভাব বদলে গেল। এমনভাবে মাথার চুল খামচে ধরলেন যেন তিনি নিজের জটাজুট ছিঁড়েই ফেলবেন। চোখ দুটো বিস্ফারিত। কর্কশ গলায় ধমক দিয়ে বললেন, তোমার কথা শুনে আমার মনের মধ্যে একটু একটু গর্বের ভাব এসেছিল। এটাও দুর্বলতা! অন্য সাধু সন্ন্যাসী কি পারে আর কি পারে না, তা আমার জানার দরকার নেই—আমি কি পারি না, সেটাই আমি ভালোভাবে জানি! ওসব কথা বোলো না!

তারপর আবার একটু শান্ত হয়ে গেলেন। চুল থেকে হাত সরিয়ে দৃষ্টি সাধারণ করে নিলেন, যাক, তোমার কি সমস্যা সেটা বলো! আমার বেশী সময় নেই।

হৃষীকেশ মাটির দিকে চোখ নিচু করে বললেন, না, আমার কিছু সমস্যা নেই। আমি এমনি আপনাকে দেখতে চেয়েছি।

—না, না, মুখ দেখেই বোঝা যায়, তুমি খুব চিন্তিত। কি হয়েছে কি?

—আপনি তাহলে আমার মনের কথাও সব বুঝতে পারেন। আপনি সবই জানেন। আপনাকে আর কি বলবো!

—না, না, ও কথা ঠিক নয়। আমি মনের কথা বুঝতে পারি না। নিজের মনকেই এখনো সংযত করতে পারলাম না—তুমি নিজের মুখে বলো।

—কিছুদিন ধরে আমার মনটা সুস্থির নেই। কতকগুলো অশুভ চিহ্ন দেখছি। মনে হচ্ছে, আমার সংসারে কোনো বিপদ আসছে। একদিন দেখলাম—

গুরু মন দিয়ে শুনে বললেন, হুঁ, এরকম তো হতেই পারে। তোমার ব্যবসার অবস্থা এখন কি রকম ?

—মোটামুটি ভালোই।

—বিদেশে তোমার ছেলে আছে, তার কাছ থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র পাও ?

—তা পাই। সে ভালোই আছে।

—ছাখো, হঠাৎ কোনো বিপদ আপদ মানুষের জীবনে আসতেই পারে। তুমি কি আশা করো, যাগযজ্ঞ করে কিংবা কোনো তাবিজ-মাদুলি দিয়ে আমি তোমার সেই বিপদ কাটিয়ে দেবো ? সেরকম ভাবে বিপদ তাড়ানো যায় কিনা আমি জানি না, অন্তত আমার সে ক্ষমতা নেই।

—না, আপনার কাছে আমি সেরকম কিছু চাই না। আমি আপনার উপদেশ চাই, তাতে আমার মনটা শান্ত হবে।

—আমি যা বলবো, তা তুমি শুনবে ?

—বলুন ?

—তোমার পঞ্চান্ন বছর বয়েস, অনেকদিন তো সংসার ভোগ করলে। ধর্মে তোমার মতি আছে, তুমি আত্মার শান্তি চাও, তাহলে এবার সংসার ছেড়ে চলো আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে কনখলের আশ্রমে থাকবে, নিজের হাতে পাকিয়ে তুটি খাবে, ইচ্ছে হয় জপ তপ কবো, না হয় শুধু পাহাড় আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থেকো চুপচাপ, দেখো অনেক শান্তি পাবে।

—কিন্তু সেখানে গিয়েও যদি সংসারের জন্য মন টানে ? ছেলে-মেয়েদের ফেলে যাবো, ওদের ভালোমন্দ—

—তাহলে যেও না। তাহলে সংসারে থাকলে যা যা ভোগ করতে হয়—সবই ভোগ করো ! গৃহী লোককে সন্ন্যাসীর আর কোনো উপদেশ থাকতে পারে না ! সংসারে থেকে শুধু সবটুকু ভোগ করবে—আর বিপদ আপদ হলে সন্ন্যাসী এসে সেটা দূর করে দেবে, তা কি হয় বাপু ? যৌবনে সংসার ছেড়ে গিয়েছিলাম কি আত্মার ডাক্তারি শিখতে ? কি ভুল করেছি এতদিন !

হৃষীকেশ রীতিমত মুষড়ে পড়েছেন। গুরুদেবের এ রকম আকস্মিক রূপান্তরের ঠিক কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছেন না। গুরুদেবের ওপর তিনি বড় বেশী নির্ভরশীল ছিলেন। বহু বিপদে আপদে, মানসিক অশান্তিতে এই সন্ন্যাসীর পরামর্শ তাঁকে অনেক শান্তি দিয়েছে। আজ যেন মনে হয়, গুরুদেব নিজেই দারুণ এক মানসিক সংকটে ভুগছেন।

দরজার বাইরে নানারকম ফিসফাস শব্দ। অনেকক্ষণ কেটে গেল, সবাই

নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছে নিশ্চয়ই। গুরু হঠাৎ মৌন ভঙ্গ করে কি এত কথা বলছেন হৃষীকেশের সঙ্গে!

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হৃষীকেশ বললেন, আপনি কিছুই খেলেন না, এটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না! কবে থেকে আপনি খাওয়া ত্যাগ করলেন?

—পরশু থেকে। একেবারে কনখলে ফিরে গিয়ে খাবো। তুমি আজই রাত্তিরে আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও। মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না—আমিই ভুল করেছিলুম, আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না!

—বাড়ির সবাই আশা করেছিল, আপনি মিঠুর জন্য কিছু করে দিয়ে যাবেন—

—কি হয়েছে মিঠুর?

—আপনাকে চিঠিতে লিখেছিলাম। ওর বিয়ের ব্যাপারে কিছুই ঠিক করতে পারা যাচ্ছে না—

—কত বয়স হয়েছে এখন মিঠুর?

—উঁ, বয়েস? ওর বযেস কত হলো? আমি ঠিক জানি না, ওর মা জানে—বাইশ কি তেইশ হবে বোধহয়—

—তেইশ? এত বড় হয়ে গেছে? সেদিনও তো কত ছোট্ট দেখেছিলাম মনে হয়। তেইশ! আচ্ছা, আমি যদি ওর বারো বছর বয়েসের সময় বলতাম ওর বিয়ে দিয়ে দাও, তাহলে দিতে? আমাদের বাল্যকালে সেই রকমই নিয়ম দেখেছি, কন্যার ঋতু আগমনের সময়েই বিয়ে হতো। এখন যুগের হাওয়া অন্যরকম, সেটা যখন মেনে নিয়েছো—

হঠাৎ হো হো শব্দে অট্টহাস্য করে উঠলেন গুরুদেব। হাসির দমকে তাঁর বিশাল শরীরটা কেঁপে উঠলো। আজ সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাঁর হাসি দেখা গেল। হাসতে হাসতে বললেন, কি অদ্ভুত কাণ্ড! অ্যাঁ? কি অদ্ভুত কাণ্ড! যে-লোক নিজে বিয়ে করেনি, নারী সম্পর্কে কিছুই জানলো না, সংসার সম্পর্কে কিছুই জানলো না, সারাজীবন কাটলো পাহাড়-জঙ্গলে, সে দেবে বিয়ে সম্পর্কে উপদেশ? সে উপদেশের কোনো মাথামুণ্ডু আছে?

হৃষীকেশ ম্লানভাবে বললেন, আপনি মিঠুকে আশীর্বাদ করে যান, যাতে ওর মঙ্গল হয়।

—ভাখো, আজ আমাকে সত্যি কথা বলার নেশায় পেয়ে বসেছে। আমি এ পর্যন্ত অনেক নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেছি—বাপ মায়ের অনুরোধে, কিন্তু

তাদের মধ্যে অর্ধেকেই জীবনে সুখী হয়নি। সেই বাপ মা-ই আবার এসেছে আমার কাছে জামাই কিংবা বউয়ের মতিগতি ফেরাবার আশায়। কি অন্ধ বিশ্বাস। সত্যি বলছি হৃষীকেশ, মানুষের নিয়তি বদলাবার সাধ্য আমার নেই। কোনো সাধ্য নেই। যাক গে, মিঠুর কি হয়েছে, সেটা শুনি! মিঠুকে আমি খুব স্নেহ করি।

—আমরা মিঠুর জন্য ভালো পাত্রের খোঁজ করছি। কিন্তু মিঠুর তাতে মত নেই। সে নিজের পছন্দ মতন বিয়ে করতে চায়।

—হুঁ। অর্থাৎ সে স্বতন্ত্রা হতে চায়। এতে তো দোষের কিছু নেই—শাস্ত্রে তো এর অনুমোদন আছে। মনু সংহিতায় আছে বিয়ে আট রকম হয়, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। তবে তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আবার বলা আছে, পৈশাচশ্চারাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যো কদাচন। অর্থাৎ পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্তব্য। গান্ধর্ব বিবাহ তো অতি প্রশস্ত—কন্যা ও বর যখন পরস্পরকে মনোনয়ন করে—

—কিন্তু গুরুদেব, লোকাচার বলে তো একটা কথা আছে!

—সে লোকাচার তো বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সংসারী লোকেদের তৈরী। তাতে শাস্ত্রের বালাই নেই, শুধু আদব কায়দার বালাই। সেজন্য সন্ন্যাসীর মতামত চাইতে আসো কেন? ছেলেটি কি করে?

—ছেলেটি ব্রাহ্মণ নয়—

—ব্রাহ্মণ নয়? কি সাংঘাতিক কথা! ব্রাহ্মণ নয়! আমাকে গুরু কবার আগে কি খোঁজ নিয়েছিলে, আমি ব্রাহ্মণ কি না? কত অব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী সেজে থাকে, তুমি তার খোঁজ রাখো? আমি জানি! সে খোঁজ না নিয়েও তুমি যদি একজনকে গুরু করতে পারো, তাহলে জামাই করতে পারো না?

—মিঠু ছেলেমানুষ, ও কি নিজের ভালো মন্দ বোঝে?

—তেইশ বছরেও যে ছেলেমানুষ, সে সারা জীবনে প্রাপ্তবয়স্ক হবে না। তেইশ বছরের সন্তানকে ছেলেমানুষ করে রাখা বাপ মায়ের অপরাধ। আমি কুড়ি বছর বয়েসে ঈশ্বরকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে ঠিক করে সংসার ছেড়েছি, আর তেইশ বছর বয়েসে একজন সংসারে নিজের সঙ্গী নির্বাচন করতে পারবে না? শোনো হৃষীকেশ, তোমাকে একটা কথা বলি! কৈশোরে বিবাহ দিলে এত ঝঞ্ঝাট থাকে না—তখন বাপ মায়ের কথা খাটে। কিন্তু যৌবনে সবাই স্বাধীনতা চায়। ডানায় জোর হলে পাখি আর বাসায় বসে না। যৌবন বড় দুঃসাহসী, সে ভালো-মন্দের সাধারণ হিসেবের ধার ধারে না!. আর, দুঃসাহসী না হলে যৌবনকে মানায় না। যৌবন কোনো বিপদকে গ্রাহ্য করে

না, মৃত্যুও তার কাছে ছেলেখেলা। ছাখো না, ওরা কি রকম ভাবে হাসে, কি রকম ভাবে রাগে, কি রকম কাঁদে—সবই সাংঘাতিক তীব্র! এত অভিমান, এত আবেগ ওদের শরীরে—ওদের হাত দিয়ে ধরে রাখা যায় না! হৃষীকেশ, যৌবনকে বাধা দিতে যেও না, তাতে অনেক কিছুই ভেঙে পড়বে শুধু—

দেয়ালে ঠেসান দিয়ে বসে এই পরিবর্তিত সন্ন্যাসী গাঢ় স্বরে বলে যাচ্ছিলেন কথা, হৃষীকেশ এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে। এতদিন পর গুরুদেবকে তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে। হৃষীকেশ এখন কি করবেন, আর কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। গুরু হঠাৎ কথা থামিয়ে বললেন, একবার মিঠুকে ডাকো, ওকে দেখি!

হৃষীকেশের যেন ঘোর ভাঙলো। আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। অলকা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে। ভগ্নকণ্ঠে বললেন, মিঠুকে এখানে আসতে বলো একবার—।

অলকাই জয়শ্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। চওড়া জরি পাড়ের একটা সাদা শাড়ী পরে এসেছে সে। সদ্য স্নান করেছে, চুল এখনো বেশ ভিজে, মুখে ও ভুরুতে জলের স্নিগ্ধ প্রলেপ। জয়শ্রী কোনোদিন গুরুদেবকে ভয় পায়নি কিংবা অতিরিক্ত সমীহ করেনি। ছেলেবেলায় গুরুদেব জয়শ্রীকে পাশে বসিয়ে নিজের খাবার থেকে ওর মুখে তুলে দিতেন।

জয়শ্রী ছেলেমানুষী অভিযোগের সুরে বলল, একি, আপনি এখনো খাননি! আমি ভেবেছিলুম, আপনার বাটি থেকে একটু ক্ষীর খাবো—

ঠোঁটে বিচিত্র হাসি, জটাজুটধারী সন্ন্যাসী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন জয়শ্রীর দিকে। ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল, এখন তো এ সম্পূর্ণ নারী। এই নারীর হৃদয়-রহস্য দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। এই হ্লাদিনী শক্তি—

জয়শ্রী বলল, গুরুদেব, আপনি খেতে বসুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

অলকার মুখটা থমথমে। একটা কিছু অস্বাভাবিকতার আঁচ তিনি এর মধ্যেই পেয়ে গেছেন। ম্লান গলায় বললেন, আপনি খেতে বসুন এখন। মিঠু আর এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো। এই জলটা অনেকক্ষণ আঢাকা রয়েছে।

—না, তার দরকার নেই। আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

—ওমা, খেলেন কোথায়? কিছুই তো ছোঁননি।

প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে তিনি বললেন, কই রে মিঠু, তুই আমায় পেন্নাম করলি নে? আসার পর তো দেখাই পেলুম না রে—

জয়শ্রী লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি প্রণাম করার জন্য এগিয়ে এসে বলল, ও সরি

সরি ! আমি ভেবেছিলাম, দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আপনার সঙ্গে যখন গল্প করতে আসবো—

বসে থাকা অবস্থায় প্রণাম নিলেন না, গুরুদেব উঠে দাঁড়ালেন। জয়শ্রী নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিল। গুরুদেব এ পর্যন্ত কারুকে আশীর্বাদ করেননি, কিন্তু জয়শ্রীর একবেণী করা চুলের ওপর হাত রাখলেন, তারপর বিষণ্ণ গলায় বললেন, আমি আর বাঁচবো না রে! আমার সঙ্গে আর তোদের দেখা হবে না!

আমূল চমকে জয়শ্রী সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দ্রুত বলে উঠলো, একি, এ কথা বলছেন কেন? এ কথা কেন বলছেন?

গুরুদেব আঙুল দিয়ে জয়শ্রীর থুতনিটা উঁচু করে তুলে ভালো করে দেখলেন মুখখানা। ক্লান্ত স্বরে বললেন, তুই বেঁচে থাকিস মা, বেঁচে থাকিস! সুখ পেতে চেষ্টা করিস!

তারপর অলকা আর হৃষীকেশের দিকে ফিরে বললেন, আমার দৈব নির্দেশ করার সত্যি কোনো ক্ষমতা নেই। তবু জয়শ্রীর মুখ দেখে কেন জানি না মনে হচ্ছে, ওর হয়তো শিগগিরই কোনো বিপদ হতে পারে। একটু সাবধানে থেকো। তোমরাই যেন ওর বিপদের কারণ হয়ো না।

॥ ১১ ॥

পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে।

—চণ্ডীদাস

গেটের সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অঞ্জন। মানুষ গলবার জায়গা নেই। রাস্তা দিয়ে আসবার সময় দূর থেকেই তাকে দেখতে পেয়েছে অনুরাধা। হাতের বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে, শাড়ীর আঁচল সামলিয়ে শরীরের সমস্ত পেশী সজাগ করে নিল। ছেলেটার দুঃসাহস দিন দিন বড্ড বেড়ে যাচ্ছে।

একেবারে সামনে এসে অনুরাধা চুপ করে দাঁড়ালো। অঞ্জন সরলো না, হাসছে না। অনুরাধা দৃঢ় গলায় বললো, সরো! এরকমভাবে দাঁড়ালে লোকে যাবে আসবে কি করে?

—দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—তোমার কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। বলেছি না, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে না!

—আরে, সব সময় এ রকম খেপচুরিয়াস হলে চলবে কি করে?

—রাস্তা ছাড়ো! তুমি ভেবেছো কি?

অঞ্জন হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠলো। আশে পাশের বাড়ির লোকজন যে দেখতে পারে, রাস্তার লোক যে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। অঞ্জনের বাবা এবং বড় দুজন দাদা আছে, তবু সে আজকাল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই সিগারেট খায়।

অঞ্জন বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি তোমাকে আজেবাজে কথা বলার জন্য ডাকিনি। একটা জরুরী দরকার আছে।

—তোমার সঙ্গে আমার কোনো দরকার থাকতে পারে না।

—আমার দরকার থাকতে পারে। তোমাকে তিরিশ টাকা চাঁদা দিতে হবে।

—চাঁদা? কিসের জন্য?

—আমাদের পার্টির জন্য।

—তোমাদের পার্টিতে আমি চাঁদা দেবো কেন! তাও আবার তিরিশ টাকা? ইয়ার্কি নাকি?

—ইয়ার্কি মোটেই নয়। আমরা তোমার নামে অ্যালট করেছি।

—তোমরা অ্যালট করলেই আমাকে টাকা দিতে হবে?

অঞ্জন পকেট থেকে একটা রসিদ বই বার করে পাতাগুলোকে ফর-র-র ফর-র-র শব্দ করতে করতে বলল, দিতে হবে, পাড়ার সব্বাইকেই দিতে হবে—

অঞ্জন একটু আলগা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুরাধা বুকের কাছে বইগুলো চেপে তার গা ঘেঁষেই ভেতরে চলে গেল।

অঞ্জন পেছনে পেছনে এসে বলল, চলে যাচ্ছো যে! টাকাটা কবে দিচ্ছ? এখন তো মাসের প্রথম, মাইনে পেয়েছো নিশ্চয়ই!

একতলায় সিঁড়ির কাছটা একটু অন্ধকার। অনুরাধা এ জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে গিয়ে সিঁড়িতে উঠতে চায়। অঞ্জন তার এত কাছাকাছি যে তার বেশ ভয় ভয় করে। যদিও সে ঠিক করেই ফেলেছে যে অঞ্জন এবার যদি তার গায়ে হাত দেয়—সে সটান এক থাপ্পড় কষাবে, তবু ভয় যায় না, বুক ঢিপ ঢিপ করেই।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়ে অনুরাধা বলল, চাঁদার কথা আমাকে বলছো কেন? আমার বাবার কাছে বলো—

—তোমার বাবাকেও দিতে হবে, তোমাকেও দিতে হবে।

—তার মানে? একই ফ্যামিলির দুজনকে চাঁদা দিতে হবে নাকি?

—নিশ্চয়ই। দুজনে চাকরি করে টাকা ঘরে আনতে পারো, আর চাঁদার বেলায় একজন? তুমি যে বাইরে টাকা খরচা করো, সেটা কি সব সময় বাবার পারমিশন নিয়ে করো?

—সেটা তোমার দেখার দরকার নেই।

—ঠিক আছে, চাঁদাটা দিয়ে যাও—

—তোমাদের পার্টি ফাণ্ডে আমি চাঁদা দিতে যাবো কেন?

—বিকজ, উই হ্যাভ সিলেকটেড ইউ!

—যদি না দিই? জোর করবে?

সিঁড়ির রেলিংটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, তার ওপরের দিকে অনুরাধা দাঁড়িয়ে, নিচে অঞ্জন। অঞ্জন এবার মুখ চোখ ভাবগম্ভীর করে বললো, না, আমরা জোর করবো না। আমরা সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম করি না। সে সিষ্টেম নেই আমাদের পার্টির। সব কিছু বুঝে শুনে তুমি স্বেচ্ছায় দেবে—

—তাহলে বলেই দিচ্ছি, অত টাকা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। একটাকা দুটাকা দিতে পারি—

অনুরাধা দোতলায় উঠে এসেছে, অঞ্জন এবার তরতর করে তার কাছে চলে এলো। অনুরাধার হাত চেপে ধরে রুক্ষ স্বরে বললো, তোমরা ভেবেছো কি? আমি কি কুকুর বেড়াল? আমি কি আমার বাপের শ্রাদ্ধের জন্য চাঁদা চাইছি। চাইছি দেশের কাজের জন্য—ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেও দেবে না? দু'মিনিট দাঁড়িয়ে কথা শোনারও ধৈর্য নেই?

—অনুরাধা কঠিন গলায় বললো, অঞ্জন, হাত ছাড়ো—

—তুমি ভদ্রভাবে দাঁড়িয়ে কথা শুনলে হাত ধরার দরকার হতো না।

—তুমি হাত ছাড়ো আগে!

—কেন, হাত ধরলে কি হাত ক্ষয়ে যায় নাকি?

প্রণবেশ দরজার কাছে এসে বিস্মিত চোখে অনুরাধার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে কি?

অনুরাধা কিছু বলার আগেই অঞ্জন বললো, কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি, আপনি ভেতরে যান।

অঞ্জনের কথা গ্রাহ্য না করে প্রণবেশ অনুরাধার দিকেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, অনুরাধা, কি হয়েছে?

অনুরাধাও প্রণবেশের কথা গ্রাহ্য না করে অঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললো, হাত ছেড়ে দাও বলছি। তোমার মতন ছেলে কি রকম দেশের কাজ করবে, তা আমার খুব জানা আছে।

—তোমার মতন ফালতু মেয়েও আমার ঢের দেখা আছে। তুমি নিজেকে ভাবো কি?

প্রণবেশ সূক্ষ্ম রুচির মানুষ, এ ধরনের দৃশ্য ও কথাবার্তা তাঁর একেবারেই পছন্দ হয় না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অঞ্জনের হাত ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, অঞ্জন, এ কি করছো কি? ওর হাত ছেড়ে দাও।

সত্যিই এবার হাত ছেড়ে দিল অঞ্জন। ধুলো ঝাড়বার মতন নিজের দু'হাত ঝাড়লো, তারপর হাত দুটি কোমরে রেখে প্রণবেশের দিকে ফিরে অস্বাভাবিক কর্কশ গলায় বললো, দেখুন ওসব টেটিয়াবাজি আমার কাছে দেখাবেন না, বুঝলেন? অন্য জায়গায় দেখাবেন।

প্রণবেশ বিমূঢ়ভাবে অনুরাধাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার কি? কিছু তো বুঝতে পারছি না!

অঞ্জন উত্তর দিল, আপনাকে কে বুঝতে বলেছে! যান, ঘরে যান। সব সময় ফ্ল্যাটের দরজা খোলা রাখেন কেন? জানেন না, ফ্ল্যাট বাড়িতে এসব চলে না?

প্রণবেশের মুখ চোখে রক্ত এসে গেল। এ রকম অপমানজনক কথা শোনার অভ্যেস তাঁর একেবারেই নেই। শান্ত মানুষটি হঠাৎ খুব রেগে গেলেন। রীতিমতন চেঁচিয়ে ধমকে বললেন, এ সব কি হচ্ছে কি? আমি দরজা খোলা রাখবো কি বন্ধ রাখবো—তা তোমার কাছে শুনতে হবে?

অঞ্জনও আর এক ধাপ গলা চড়িয়ে বললো, চেল্লাবেন না, মেলা চেল্লাবেন না! আপনি এখানে বসে বসে গেঁড়েমি করবেন, আর আমরা সব সহ্য করে যাবো।

অনুরাধা তিন-চার ধাপ-সিঁড়ি ওপরে উঠে এসেছে। সে ভীষণ অসহায় বোধ করলো, কি করে ওদের ঝগড়া থামাবে! প্রণবেশ তাকে উদ্ধার করবার জন্য এসেছিলেন, কিন্তু প্রণবেশকে সেই ভূমিকাতেও অনুরাধা পছন্দ করতে পারছে না। একবারও সে প্রণবেশের সঙ্গে কথা বলেনি। অথচ লোকটির জন্য মায়াও হয়। অঞ্জন যে-রকম গোঁয়ার ছেলে, যদি ওঁকে আরও অপমান করে—বৌদি নিশ্চয়ই সব শুনতে পাচ্ছেন ঘর থেকে, ইস্ ভাবাই যায় না—অঞ্জনকে বারণ করলে কি সে শুনবে? তিরিশ টাকা চাঁদার জন্য—টাকা সে কালই দিয়ে দেবে না হয়। একবার অনুরাধা ভাবলো, প্রণবেশকে সে অনুরোধ

করবে, আপনি ঘরে চলে যান। আবার ভাবলো, অঞ্জনকে বলবে, তুমি আব চেঁচিয়ো না, একটু বাদেই তোমার চাঁদা দিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু লজ্জায় ঘৃণায় অনুরাধা অবশ হয়ে পড়লো। সে কিছুই বললো না, ওপরে উঠে গেল দ্রুত পায়ে। ওরা তখনও চেঁচামেচি করছে।

অনুরাধার মা জিজ্ঞেস করলেন, নিচে ওবকম গোলমাল হচ্ছে কিসেব বে?

অনুরাধা সুস্থির হয়ে ভালো করে দম নিল। বুকটা একেবারে খালি হয়ে গেছে, একটুও হাওয়া নেই। তারপর, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বললো, কিছু জানি না, কিছু জানি না। মা, চলো, এ বাড়ি ছেড়ে আমরা উঠে যাই। এ বাড়িটা আমাব সহ্য হচ্ছে না। এ বাড়িতে বেশীদিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

পরদিন থেকে কিন্তু অঞ্জনের ব্যবহাব একেবাবে পাল্টে গেল। অঞ্জন আর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে না। অনুরাধা বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কিংবা ফেববাব সময়ও আশেপাশে দেখতে পায় না অঞ্জনকে। সেই চ যেব দোকানেব সামনের আড্ডাও বন্ধ কবে দিয়েছে সে। অঞ্জন আর চাঁদা চাইতেও এলো না।

দু'তিনদিন বাদে অঞ্জনকে একদিন দেখলো রাস্তায়। অনুরাধা গলিব মোড ঘুরেই অঞ্জনেব একেবারে মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল। অঞ্জন অনুরাধাব দিকে এক পলক মাত্র তাকিয়েই মুখ ঘুবিয়ে নিলো. একটিও কথা না বলে চলে গেল পাশ কাটিয়ে।

অনুরাধাব স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচা উচিত ছিল, কিন্তু বিস্ময় আর অস্বস্তি হলো তার চেয়ে বেশী। অঞ্জনের এই পবিবর্তনেব সে কোনো কারণ খুঁজে পায় না। সেদিন সে সিঁড়িতে কি তেমন কিছু অপমান করেছে অঞ্জনকে? অনুরাধা মনে মনে অঞ্জনকে চাঁদা দেবাব ব্যাপাবে প্রস্তুত হয়েই ছিল কিন্তু চাঁদা তো চাইতে আসছে না। নিজে থেকে সেধে সেধে কি দেবার কোনো মানে হয়?

এবপর অঞ্জনের সঙ্গে যখনই দেখা হয়, অঞ্জন মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঠিক ঘৃণা নয়, যেন সে অনুরাধাকে কোনোদিন চেনেই না। অচেনা মেয়েদের দিকেও তো ছেলেরা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে—অঞ্জন তাও করে না। অঞ্জন অন্তত চাঁদাটা নিয়ে নিলেও অনুরাধা স্বস্তি পেত। টাকাটা সব সময় ব্যাগে রাখে, একদিন রাস্তায় তার দিকে একটু ব্যগ্রভাবে হাসিমুখে তাকালো পর্যন্ত, অঞ্জন গ্রাহ্য করলো না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় অনুরাধা আজকাল দোতলার দরজার দিকে একদম তাকায় না। সব সময় চোখ নিচু করে থাকে। কখনো কখনো সে দরজার কাছে প্রণবেশের উপস্থিতি টের পায়, কিন্তু কিছুতেই চোখে চোখ ফেলে

না। প্রণবেশ মৃদু গলায় ডাকলেও সাড়া দেয় না। ভিখারীর মতন করুণ আবেদনময় গলায় লোকটি তাকে ডাকে। অমন সম্মানিত সং লোকটির এই পরিণতিতে অনুরাধার মাঝে মাঝে মায়া হয়, কিন্তু তার তো কিছু করার নেই।

রিনি ওপরে এসে তাদের ঘরে খেলা করে। মাঝে মাঝে অনুরাধাকে চুপি চুপি বলে, টুকুমাসী, তুমি আমাদের ঘরে যাবে না? বাবা তোমাকে ডেকেছে। এতটুকু মেয়ের মনে আঘাত দিতে চায় না অনুরাধা। মিষ্টি হেসে বলে, কয়েক-দিন পরে যাবো। এখন আমি কলেজের পরীক্ষার খাতা দেখছি তো। তোমার মা কেমন আছে? মা-কে বোলো, আমি শিগগিরই যাবো।

এ বাড়ির সবাই প্রণবেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অনুরাধার মা-বাবা তো প্রায়ই বলেন, ওরকম ধীর স্থির দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ আজকাল আর দেখা যায় না। বউয়ের ওরকম অসুখ, অথচ মানুষটার মুখে টু শব্দটি নেই, অতটুকু মেয়ের সব ঝক্কি সামলানো, একদিনও অফিস থেকে দেরী করে ফেরে না। এই সব আলোচনার সময় অনুরাধা চুপ করে থাকে।

কলেজ যাবার জন্য অনুরাধাকে ভোরে উঠতে হয়, একদিন আরও ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। বাড়ির সামনে নানা রকম অচেনা শব্দ। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুরাধা দেখলো, তাদের গেটের সামনে তিন গাড়ি পুলিস। বন্দুক হাতে সিপাহীরা সারা গলিতে গিজগিজ করছে। আজকাল পুলিস দেখলে বেশী ঔৎসুক্য দেখাতে নেই। জানালার কাছ থেকে সরে এলো অনুরাধা। একটু বাদেই জেগে উঠলো বাড়ির আর সবাই। পুলিসের আগমন বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল অনেক রকম। অনুরাধার ছোট ভাই-বোন দুজন নিচে যাবেই দেখতে। কিছুতেই তাদের আটকে রাখা যায় না।

খানিকক্ষণের মধ্যেই অবশ্য খবর পাওয়া গেল, পুলিস এসেছে অঞ্জনকে ধরতে। অঞ্জন বাড়ির পেছনের দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তাও ধরা পড়ে গেছে। এখন তাদের ফ্ল্যাট সার্চ করা হচ্ছে।

ঐটুকু একটা ছেলেকে ধরার জন্য তিন গাড়ি পুলিস লাগে — এটা ভেবে অবাক হয়ে গেল অনুরাধা। কি করেছে অঞ্জন? সে কোনো হীন অপরাধীর মতন কাজ করেছে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। বি. এস-সি পাস বুদ্ধিমান ছেলে। ক্রমশ আরও খবর এসে যায়। অঞ্জনের ঘরে তিনটে তাজা বোমা ও আরও মাল-মশলা পাওয়া গেছে, এছাড়া পোস্টার ও কাগজ-পত্র। তার নামে মারাত্মক দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগ।

স্নান সেরে নিয়ে সময় মতন কলেজে যাবার জন্য তৈরি হলো অনুরাধা।

মনটা খুব বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। একতলায় সিঁড়ির কাছে তখনো পুলিসের ব্যস্ত আনাগোনা। অঞ্জনের বাবা আর মায়ের বিবর্ণ মুখ চোখে পড়ে। রীতিমতন ভিড় ঠেলে রাস্তা করে নিয়ে এগুতে হলো অনুরাধাকে।

একটা পুলিসের গাড়িতে বসিয়ে রাখা হয়েছে অঞ্জনকে। তার হাত বাঁধা, দু'পাশে দুজন বন্দুকধারী সিপাহী। অঞ্জনের মুখে একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব। অনুরাধার দিকে চোখ পড়তেই আজও মুখ ঘুরিয়ে নিল অঞ্জন; অনুরাধা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেন দুম করে একটা ধাক্কা লাগলো তার বুকে। আজ অঞ্জনের এই অবহেলায় সত্যিকারের অপমানিত বোধ করলো সে। তার মনে হলো তবুও এগিয়ে গিয়ে অঞ্জনকে কিছু বলা উচিত। কিন্তু কি বলবে? একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু কি? দ্বিধায় দাঁড়িয়ে দুললো খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে চলে গেল।

সন্ধ্যের পর শান্তনুর সঙ্গে দেখা হলো অনুরাধার। শান্তনু কলেজে তার কাছে ফোন করেছিল। অফিস থেকে ফিরে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল শান্তনু, অনুরাধা এলো সেখানে। দুজনে গিয়ে বসলো একটা ঠাণ্ডা রেস্তোরাঁয়। টেবিলের ওপর দু'হাত রেখে তাতে থুতনি ছুঁইয়ে ক্লান্ত ভাবে শান্তনু বললো, আজ আমার মনটা খুব খারাপ লাগছে।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করলো, কেন?

—আমি কি রকম যেন বদলে যাচ্ছি। আমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, সে রকম কাজ করছি। দুদিন আগে অফিসে, বুঝলে অনুরাধা, হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করলাম। আমার একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রায়ই কাজে ভুল করে—বুড়ো মতন লোকটি, বুদ্ধি স্বদ্ধি তেমন নেই, সহজ কথাটাও চট করে বুঝতে পারে না। প্রায়ই লোকটিকে নিয়ে আমার ঝঞ্ঝাট হয়। কিন্তু পরশুদিন সামান্য একটা ভুল করেছে, আমার মেজাজ এমন গরম হয়ে গেল যে আমি হঠাৎ টেবিলের ওপর এমন জোর থাপ্পড় দিলাম যে কালির দোয়াত উল্টে কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেল, তাতেও আমার জ্ঞান হলো না, আমি লোকটিকে বললাম, এ রকম গোবর পোরা মাথা নিয়ে কতদিন আর কাজ করবেন। লোকটি একেবারে কুঁকড়ে গেল, অপমানে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে—আমার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার একেবারেই আশা করেনি—আমিও নিজে বুঝতে পারছি না এখনো, কি করে বাবার বয়সী একজন লোককে এইভাবে—

শান্তনুকে খুবই অনুতপ্ত মনে হলো। অনুরাধা নরম গলায় বললো, তাতে কি হয়েছে, সবসময় কি আর মানুষের মেজাজ ঠিক থাকে। ভদ্রলোকের কাছে একদিন না হয় ক্ষমা চেয়ে নেবেন।

শান্তনু শূন্য চোখ তুলে বললো, তার আর উপায় নেই।

—কেন ?

—সেই ভদ্রলোক কাল অফিসে আসেননি। আজ সকালবেলা অফিসে গিয়ে শুনলাম, গতকাল শেষ রাত্তিরে লোকটি মারা গেছে! হঠাৎ স্ট্রোক হয়ে—

অনুরাধা চুপ করে খানিকক্ষণ বসে রইলো। এমন ধরনের একটা ঘটনা যে চট করে কোনো মন্তব্য করা যায় না। খানিকটা বাদে কিছু বলতে যেতেই শান্তনু হাত তুলে তাকে বাধা দিয়ে বললো, না, না, আমাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো দরকার নেই। আমার ঐ বকুনির জন্যই ভদ্রলোক মারা গেলেন, এটা হয়তো সত্যি নয়। ভদ্রলোকের বয়েস হয়েছিল, হার্টের অসুখও নাকি ছিল—এসব পরে শুনলাম, মৃত্যুটা হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু আমার তো মন খারাপ হবেই। লোকটি শুধু শুধু আমার কাছ থেকে অপমানিত হয়ে মরে গেল! আমি বলেছিলাম, এ রকম বুদ্ধি নিয়ে আর কতদিন চাকরি করবেন ? অভিমান করে আর একদিনও চাকরি করলো না।

অনুরাধা আঙুল দিয়ে টেবিলের কাচে নাম লিখতে লিখতে বললো, এ নিয়ে বেশী ভাবা কিন্তু উচিত নয়।

আর কি ভাববো, বলতে পারো ? জানো, আমার এ রকম মেজাজ খারাপ হবার জন্য কে দায়ী ? জয়শ্রী। সাত-আটদিন ওর কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাড়ি ভাড়ার অ্যাডভান্স নেওয়া হয়ে গেছে, আর ছ'দিন বাদে রেজেস্ট্রি হবার কথা ওর কাছ থেকে যদি কোনো খবর না পাই, তাহলে আমার মনের অবস্থা কি রকম হয় বলো! শুধু অফিসের ঐ ব্যাপারটাই নয়—আমাদের বাড়িতে একজন ইহুদী থাকে—ঐ যে যাকে তুমি দেখেছিলে, চোখের অসুখ নিরীহ লোক হঠাৎ তার সঙ্গেও একদিন ঝগড়া হয়ে গেল। কাল একটা ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে আর একটু হলেই মারামারি করতাম। জানো, আমি মোটেই এ রকম ভায়োলেন্ট স্বভাবের ছিলাম না। মানুষের সঙ্গে কক্ষনো খারাপ ব্যবহার করিনি। কিন্তু আমার একদম ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেছে। পুরুষ মানুষ হিসাবে এটা যেন আমার পক্ষে অপমানজনক ব্যাপার। আর একটা কথা ভেবে ছাখো আমার আর কেউ নেই, ঠিক সেই রকম কোনো বন্ধুও নেই, মন খারাপ হলে—অফিসে ঐ বিশ্বনাথবাবুর ব্যাপারটা যে কারুকে বলে একটু হাল্কা হবো—

অনুরাধা মুখ তুলে হাসিমুখে বললো, জয়শ্রী পরশু আসবে।

—তোমার সঙ্গে আজ দেখা হয়েছিল ?

—না, টেলিফোনে কথা হয়েছে।

— ও আমার চিঠির উত্তর দেয় না কেন বল তো ?

—কবে চিঠি লিখেছেন ?

— কয়েকদিনের মধ্যে দুটো চিঠি লিখেছি। সত্যি অনুরাধা, আমার মনটা খুব অস্থির হয়ে আছে।

অনুরাধা চার-পাঁচদিন জয়শ্রীদের বাড়ীতে যায়নি, তাই শান্তনুর কোন চিঠির কথা সে জানে না। হাসতে হাসতে বললো, আপনি বড্ড বোকা বোকা প্রেমিকের মতন ব্যবহার করছেন। চিঠি লিখতে পারেনি তার কারণ, ওদের বাড়িতে ওর বাবার গুরুদেব না কে এসেছে, অনেক লোকজন—

—গুরুদেব ? তিনি বুঝি মন্ত্র দিয়ে জয়শ্রীর মন ঘুরিয়ে দেবেন ?

—চেষ্টা হচ্ছে বোধহয়।

—খুব যজ্ঞ-টজ্ঞ হচ্ছে নিশ্চয়ই। এ সব যজ্ঞে খুব ঘি লাগে।

দুজনে প্রাণ হাল্কা করে খানিকটা হেসে নেবার পর অনুরাধা বললো, শুনুন মশায় আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। জয়শ্রীর মন বদলানো কোনো সাধু সন্ন্যাসীর কর্ম নয়। খুব তেজী মেয়ে,এখনো চেনেন নি তো।

একটু বাদে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে অনুরাধা আস্তে আস্তে বললো, আমারও খুব মন খারাপ।—একটি ছেলে আমাদের বাড়িতেই একতলার ফ্ল্যাটে থাকে, অঞ্জন—আজ তাকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেল – আমার মনে হচ্ছে, আমারও যেন কোনো দোষ আছে।

—আমি তো তোমার কোন দোষ দেখতে পাচ্ছি না।

—আপনার পক্ষে দেখতে পাবার কথাও নয়। ঠিক যেমন, আপনার অফিসের ব্যাপারে আমি বিশেষ কোনো দোষ দেখছি না আপনার। এই সব দুঃখগুলো বড্ড ব্যক্তিগত, অন্য কারুকে বলে ঠিক বোঝানো যায় না, অথচ না বলেও পারা যায় না। আমার খালি মনে হচ্ছে, আমিও যেন অপরাধী, আমার কিছু একটা করা উচিত ছিল, অথচ কি করা উচিত ছিল বলুন তো ?

—আমি জানি না, অনুরাধা সত্যি আমি জানি না।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলো। তারপর বেরিয়ে পড়লো, রেস্তোরাঁ থেকে। নিঃশব্দেই হাঁটলো খানিকক্ষণ। শান্তনু বললো, চলো তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিই।

—না, থাক, তার দরকার নেই।

—কেন ?

—আপনাকে উল্টো দিকে যেতে হবে।

তারপরেই গুমোট কাটিয়ে হেসে উঠলো অনুরাধা। বললো, আপনার

আজ কার সঙ্গে বেড়াবার কথা, আর কার সঙ্গে বেড়াচ্ছেন! যাক আর বেশী দেরি নেই। জয়শ্রী কিন্তু পরশু আসছে, মনে থাকবে তো? ছ'টার সময় গড়িয়াহাটের মোড়ে সেই জায়গায়—

—তুমিও আসবে তো?

—না।

—কেন?

—বাঃ, আমার কাজ থাকতে পারে না। তাছাড়া, আপনারা কি সব সময়েই আমার সঙ্গে গল্প করবেন নাকি! নিরিবিলি কোনো কথা নেই? কত প্ল্যান প্রোগ্রাম—

—না, প্লিজ, তুমি এসো।

—না, পরশু আমি সত্যিই আসবো না। রেজিষ্ট্রির দিন যাবো।

—সে তো তোমাকে আসতেই হবে। পরশুও যদি জয়শ্রী না আসতে পারে, তাহলে কিন্তু আমার মাথার ঠিক থাকবে না। আমি তাহলে সটান ওদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হবো, দরকার হলে জোর করে ওকে কেড়ে আনবো।

—বাঃ, এই তো চাই!

অনুরাধা বাড়ির গলিতে ঢুকে গেলেও অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো অনন্ত।

॥ ১২ ॥

ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি
আত্মানস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।

—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

(অরে মৈত্রেয়ী), অন্য সকলের প্রীতির জন্যই যে সকল লোক কখনো প্রিয় হয় না, নিজ নিজ প্রীতির জন্যই সেই সকল লোককে প্রিয় বলে মনে হয়।

সারা ঘরে ঘুরতে ঘুরতে জয়শ্রী চিরুনি বোলাচ্ছে। কোথাও বেশীক্ষণ সে স্থির হয়ে থাকতে পারে না। জয়শ্রীর গলায় গুন গুন গান, কখনো সে জানলার কাছে, কখনো আয়নার সামনে।

খোঁপা বাঁধা সবে শেষ হয়েছে তখন হৃষীকেশ জয়শ্রীকে ডাকলেন। গুরুদেব চলে যাবার পর হৃষীকেশ রীতিমতন মুষড়ে পড়েছেন, অফিস থেকে তাড়াতাড়ি

বাড়ি ফিরে আসেন, বাড়িতেও চুপচাপ বসে থাকেন বেশীক্ষণ। কারুর সঙ্গে বেশী কথা বলেন না।

বেলা ছোট হয়ে এসেছে, বিকেল ফুরোতে না ফুরোতেই অন্ধকার হয়ে আসে। বারান্দার সামনে ইজিচেয়ারে বসে আছেন হৃষীকেশ। জয়শ্রী ঘরে ঢুকে বললো, বাবা, আলো জ্বালোনি কেন?

—থাক, আলো জ্বালাতে হবে না। তুই একটু এদিকে আয় তো মা—

জয়শ্রী কাছে এগিয়ে আসবার পর তার সাজপোশাক দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কোথাও বেরুচ্ছিস নাকি?

—হ্যাঁ কাকীমার সঙ্গে একটু বেরুবো।

—কোথায়?

—জানি না, কাকীমা কোথায় বেড়াতে যাবেন বললেন—

—ও, আচ্ছা, তা হলে যা।

—কেন, ডেকেছিলে কেন?

—এমনিই, ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে দুটো কথা বলবো—

—বলো না। এখনো তো দেরী আছে।

—ঐ মোড়াটা টেনে নিয়ে বোস্। হ্যাঁরে, তোর মায়ের শরীরটা যে বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, দেখেছিস?

—কই না তো। কি হয়েছে? কোনো অসুখ টসুখ তো করেনি—

—বাইরে থেকে বোঝা যায় না। বড্ড চাপা তো—

—না, বাবা, তুমি বেশী বেশী ভাবছো। মার কিচ্ছু হয়নি।

—না হলে তো ভালোই। তবে একটু লক্ষ্য রাখিস। এতদিন তোদের মা তোদের যত্ন করেছে, এখন তোরা বড় হয়েছিস, এখন তোরা তার যত্ন নিবি।

—বাবা, তোমার শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ রে, আমি ভালো আছি।

—তুমি আজকাল এরকম মনমরা হয়ে থাকো কেন? মহারাজজী এবার হঠাৎ চলে গেলেন বলে তোমার খুব দুঃখ লাগছে বুঝি?

—না রে, তা নয়। গুরুদেব একটা কথা বলেছিলেন, সেটা নিয়ে ভাবছি। গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, ওঁর সঙ্গে ওঁর আশ্রমে গিয়ে থাকতে—

—চলো না, আমরা সবাই মিলে একবার বেড়িয়ে আসি। সেই যে একবার গিয়েছিলাম, কি চমৎকার লেগেছিল। কি ভালো যে জায়গাটা—

হৃষীকেশ ম্লানভাবে হেসে বললেন, না রে, সে-রকম যাওয়ার কথা বলেননি।

জয়শ্রীও একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সবাই মিলে যাওয়া হলেও অবশ্য সে যাবে না। আর কয়েকদিন বাদেই তো সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

হৃষীকেশ বললেন, গুরুদেব সংসার ছেড়ে যাওয়ার কথাতেই ক'দিন ধরে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ছে। ধর, যদি আমি সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই, তাহলে তোর মায়ের কি হবে?

—বাঃ, তুমি যাবে কেন? তুমি যেখানে যাবে, মা-ও সেখানে যাবে।

হৃষীকেশ এক দৃষ্টে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই আধো অন্ধকারে তাঁর তন্বী কন্যার দিকে তাকিয়ে তিনি সম্ভবত জয়শ্রীর বাল্যকাল পর্যন্ত দেখতে পেলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, একটা গল্প শুনবি?

—গল্প? জয়শ্রী একটু হাসলো। তারপর কচি মেয়ের মত আবদার মাখা গলায় বললো, হাঁ, একটা গল্প বলো, অনেকদিন তোমার কাছ থেকে গল্প শুনিনি।

হৃষীকেশ চেয়ারে হেলান দিয়ে কপালের ওপর দু'হাত রাখলেন। তারপর অবিষ্ট গলায় বললেন, সেটা ছিল খুব দুর্যোগের রাত। ঠিক সালটা আমার মনে নেই তবে কুড়ি-বাইশ বছর আগে। সারাদিন ধরে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল, সন্ধ্যে থেকে খুব বাড়লো আর সেই সঙ্গে দারুণ ঝড়। আমি একজোড়া স্বামী-স্ত্রীর গল্প বলছি। তাদের তখন গাড়ি ছিল না, মোটামুটি সাধারণ অবস্থা। বৌটির বাচ্চা হবার কথা, ন'মাস চলছে, আরো কিছুদিন বাকি আছে। কিন্তু সেই রাত্তিরেই ব্যথা উঠলো, সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। দিনের বেলা কিছু বোঝা যায়নি, কাজকর্ম করেছে, সবই স্বাভাবিক ছিল — কিন্তু হঠাৎ মাঝ রাত্তিরে ঐ ব্যথা। স্বামীটি পাড়ার এক ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে রেখেছিল যে, যদি কোনোদিন বেশী রাত্রে দরকার হয়, তাকে ডাকবে। ট্যাক্সিওয়ালা রাজি ছিল। কিন্তু এমনই কপাল সেদিন তাকে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না মানে, তার যাবার ক্ষমতা নেই, বৃষ্টি বাদলার দিন দেখে সে খুব নেশাটেশা করেছিল। স্বামীটির এক আত্মীয়ের গাড়ি ছিল, তাকে ফোন করা হলো, সেই আত্মীয়ও তখন কলকাতায় নেই।

অনেক ছোটাছুটি করেও ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। রাস্তায় এক হাঁটু জল। এদিকে বউটি তো যন্ত্রণায় একেবারে নীল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমেই হঠাৎ এতটা ব্যথা সাধারণত হয় না। শেষ পর্যন্ত একটা ঘোড়ারগাড়িতে করে বৌটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন ঘোড়ারগাড়ি চলতো, ওদের বাড়ি থেকে হাসপাতাল খুব দূরও ছিল না অবশ্য।

হাসপাতালে পৌঁছুবার পর ডাক্তার বললো, তক্ষুনি অপারেশন করতে হবে।

কি যেন একটা গোলমাল হয়েছিল, অপারেশন করলেও বাচ্চা আর মা দুজনকে বাঁচানো যাবে না। বাচ্চাকে বাঁচাতে গেলে মায়ের জীবন—

হৃষীকেশ তড়াক করে সোজা হয়ে বসে জয়শ্রীর একটা হাত চেপে ধরে বললেন, তুই হয়তো এ গল্প শুনলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবি না, কিন্তু আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম, সন্তানকে বাঁচাবার দরকার নেই, অলকাকে বাঁচান। আমি একটুও ভাবিনি পর্যন্ত। তোর মা ঠিক টের পেয়েছিল, এত যন্ত্রণার মধ্যেও জ্ঞান হারায় নি, অনবরত চিৎকার করছিল, না ওকে বাঁচাতেই হবে, বাঁচাতেই হবে।

তারপর তিনটে ঘণ্টা যে আমার কি রকমভাবে গেছে, আমি বলে বোঝাতে পারবো না। পরেশ তখন কত ছোট, সর্বক্ষণ আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার বাবা মা কেউ বেঁচে ছিল না। আমাকে ভরসা দেবার কেউ ছিল না। অপারেশন রুম থেকে তোর মাকে যখন বার করে নিয়ে এলো—একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা ট্রলির ওপর শোওয়ানো—মৃতদেহ ঠিক ঐভাবে নিয়ে যায় - আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম। একজন নার্স এসে বললো আমার একটি মেয়ে হয়েছে। তখন সেই মেয়েকে হাতের কাছে পেলে বোধ হয় আমি গলা টিপেই মেরে ফেলতাম। তখনও অলকা বাঁচবে কি না ঠিক ছিল না—আরও চব্বিশ ঘণ্টা যমে মানুষে যুদ্ধ হয়। ডঃ কে. বি. ব্যানার্জি ছিলেন তখনকার খুব বড় ডাক্তার, তিনি নিজে অপারেশন করেছিলেন। চব্বিশ ঘণ্টা বাদে অলকা যখন চোখ মেললো, প্রথম কথাই বললো, সে কোথায়? আমার কথা বলেনি, অলকা তোকে দেখতে চেয়েছিল।

হৃষীকেশ যতটা আবেগের সঙ্গে ও অভিভূত গলায় কাহিনীটা বললেন, জয়শ্রীর মধ্যে কিন্তু সে রকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। এখনকার ছেলেমেয়েরা এগুলোকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। জয়শ্রী এতক্ষণ একসঙ্গে গল্পটা শুনছিল, এবার হাসতে হাসতে হালকাভাবে বললো, বাবা, তুমি তাহলে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে? ভাগ্যিস মেরে ফেলোনি।

হৃষীকেশ গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। তারপর কম্পিত গলায় বললেন, হ্যাঁ রে, আমি তোকে এ পৃথিবীতে আসতে দিতে চাইনি। ডাক্তার যে খুব জোর দিয়ে বলেছিল, দুজনের একজনই শুধু বাঁচবে, তাই আমি অলকাকে—

—তুমি তো ঠিকই করেছিলে।

—তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ঐ ছোট্ট একরত্তি বেড়াল ছানার

মতন একটা বাচ্চা কোনোদিন এমন সুন্দর হয়ে উঠবে। তোর মায়ের কিন্তু কোনো ভুল হয়নি। সে নিজের জীবন দিয়েও তোকে বাঁচাতে চেয়েছিল। তোর ওপর অলকারই পুরোপুরি দাবি—

জয়শ্রী উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ তুমি আজ আমাকে এটা বললে কেন?

এমনিই। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ছে ক'দিন ধরে—

—না, তুমি নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণে এটা বললে—

—কি কারণ বল্ তো?

—তুমি বলো।

—আমি ভেবেছিলাম, তুই এটা শুনলে আমার ওপরে খুব রেগে যাবি।

—বাঃ, রাগ করবো কেন? এ রকম অ্যাক্সিডেন্টাল ব্যাপার তো হয়ই। অ্যাক্সিডেন্ট থেকে মানুষের জীবনে অনেক কিছুই হয়। এখন আমি এত বড় হয়েছি, তাই মরার কথা ভাবলে ভয় লাগে, কিন্তু যদি না-ই জন্মাতাম, তাহলে আর মরতে কি আপত্তি ছিল।

—তুই জন্মাস নি, এ কথাটা তুই ভাবতে পারিস?

এখন পারি না অবশ্য।

—আমি তো তাই-ই ভেবেছিলাম। মিঠু, আমাকে তুই যা-ই ভাবিস, তোর মাকে তুই দুঃখ দিস না।

—আমি তো তোমাকে কিংবা মা-কে, কারুকেই দুঃখ দিতে চাই না। তোমরা শুধু শুধু নিজেদের জেদটা আঁকড়ে ধরে আছো কেন?

—এ কি শুধু জেদ?

—বাবা, তুমি তো আমাকে চেনো, তোমার কি ধারণা, আমি বোকার মতন কোনো কাজ করতে পারি?

—তোর কি ধারণা, আমরা তোর বাপ-মা হয়ে তোকে ভুল উপদেশ দিচ্ছি? তোর খারাপ চাইছি?

এতক্ষণ তর্ক করা জয়শ্রীর ধৈর্যে পোষায় না। সে হঠাৎ অনুভব করলো, তাকে যেন একটা যুক্তির জালে বেঁধে ফেলা হচ্ছে। এখন নূতন কোনো যুক্তি দিয়ে তার পক্ষে উদ্ধার পাওয়া মুশকিল। সুতরাং এর পর তার পক্ষে সবচেয়ে যেটা স্বাভাবিক সে তা-ই করলো। সে ভয়ঙ্কর অভিমানের সঙ্গে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। এবং অবুঝের মতন বার বার বলতে লাগলো, তোমরা তখন আমাকে মেরে ফেলো নি কেন? কেন মেরে ফেলো নি?

হৃষীকেশ অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করলেন। জয়শ্রীকে তার জন্ম-কাহিনীটা যখন শোনাচ্ছিলেন, তখনই তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল যে ও কেঁদে ফেলবে। তখন মেয়ে দিব্যি হাসতে লাগলো, এখন কি এমন বলা হয়েছে, যার জন্য এত কান্না। এসব তাঁর বুদ্ধির অগম্য। তিনি ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, এই মিঠু কাঁদছিস কেন। কি পাগল মেয়ে। এই মিঠু। তোর মা কোথায় গেল? অলকা—

বাবার হাত ছাড়িয়ে জয়শ্রী ছুটে বেরিয়ে গেলো, দুপদাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা চলে এলো রান্নাঘরে। অলকা তখন ঠাকুরকে রান্না বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, ঠাকুরের সামনেই জয়শ্রী অলকার দু'হাত ধরে বললো, মা, তুমি সত্যি করে বলো তো, তুমি সেদিন বলো নি, আমি যাতে সুখী হবো, তুমি সেটাই চাও?

অলকা বললেন, একি, তুই এরকম করছিস কেন? হ্যাঁ, বলেছিলাম তো।

—সত্যি করে বলো, মন থেকে বলেছিলে?

—হ্যাঁ, বলেছি। তুই যা চাস—

—তা হলে জেনে রাখো, শান্তনুকে আমি বিয়ে করবো, এটা ফাইন্যাল, ফাইন্যাল, ফাইন্যাল। এরপর যতই তোমরা বাধা দেবার চেষ্টা করবে, ততই নিজেরা দুঃখ পাবে। তাতে আমার কোনো দোষ নেই। আর কয়েকদিন বাদেই—

অলকা তাড়াতাড়ি জয়শ্রীকে রান্নাঘর থেকে বার করে আনলেন। সুজাতাও বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। অলকা বললেন, মিঠু একটা কথা শোন্, মাথা ঠাণ্ডা কর্। আমি ঐ ছেলেটির সঙ্গে নিজে দেখা করবো—

—কোন্ ছেলেটির?

—ঐ শান্তনুর সঙ্গে। আমি নিজে তাকে অনুরোধ করবো তোকে বিয়ে করার জন্য। তাহলে তুই খুশী হবি তো? তোর বাবাকে আমি যে-করেই হোক রাজী করাবো। কিন্তু তুই একটা কথা দে, কিছুদিন অপেক্ষা করবি? অন্তত ছ'মাস। গুরুদেব বলেছেন, তোর একটা ফাঁড়া আছে, সেইজন্য উনি এত বেশী চিন্তা করছেন। তোকে এখন একটু সাবধানে থাকতে হবে—

—তোমরা আর বাধা না দিলেই আমার ফাঁড়া কেটে যাবে।

সুজাতা হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা বিয়ে-পাগলা মেয়ে হয়েছে দেখছি। ঠিক আছে বাবা! তোর ঐ প্রফেসারের সঙ্গেই বিয়ে হবে। প্রফেসারের গিন্নী না হতে পারলে তোর আর আশা মিটছে না দেখছি।

—মোটেই সে এখন প্রফেসারি করে না।

—ঐ হলো ! একবার যে প্রফেসারি করে, সে পরে আর যাই করুক, এমন কি পার্লামেন্টের মেম্বার হলেও প্রফেসার থাকে। নে এখন চল, বেরুবি না ?

অলকা বললেন, সেই ভালো, যা একটু কাকীমার সঙ্গে ঘুরে আয়। কোথায় যাবে তোমরা ?

—রবীন্দ্র সদনে মায়ার খেলা হচ্ছে, সেটা দেখে আসি। মিঠু, মুখে একটু পাউডার বুলিয়ে নে, কেঁদে তো ভাসিয়েছিস—মুখের যা ছিরি হয়েছে। দিদি, তুমিও যাবে নাকি ?

—না, তোমরাই যাও। সাবধানে যেও কিন্তু। যা দিনকাল।

বাড়ির গাড়ি নেয়নি, ওরা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েছে। খানিকটা দূর আসবার পর সুজাতা বললেন, নে, আর মুখ গোমড়া করে থাকতে হবে না। বাবা মা'র কথা শুনে বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে নেই।

—কোথায় মুখ গোমড়া করে আছি ?

—আছিসই তো। ডান দিকের ভুরুটা একটু মুছে ফ্যাল, পাউডার লেগে। দেখি, টিপটা দেখি। এঃ, একটু ব্যাঁকা পরেছিস তো। যাকগে, এমন কিছু না। হ্যাঁ রে মিঠু, তোর সেই প্রফেসার বন্ধুর সঙ্গে কোথায় কোথায় দেখা করিস রে ?

—কাকীমা তুমি প্রফেসার প্রফেসার বলবে না। ওর বুঝি নাম নেই ?

—ও হ্যাঁ, কি নাম যেন ওর ? শান্তনু। হ্যাঁ, শান্তনু। আমার এক মাসীর ছেলের নামও শান্তনু, রোগা লিকলিকে চেহারা, চোখটা একটু ট্যারা —শান্তনু নাম শুনলেই আমার তার কথা মনে পড়ে।

—আহা ! হ্যাণ্ডলুম হাউসে কাউণ্টারে বসে একটি মেয়ে, ঠিক বেগুন ভাজার মত মুখ, তার নামও তো সুজাতা। আমার বুঝি সুজাতা শুনলে তার কথা মনে পড়ে ?

সুজাতা খুব একচোট হাসলেন, তারপর বললেন, সত্যি, হ্যাণ্ডলুম হাউসের মেয়েটা একটুতেই কি রকম মুখ করে। আমি সেদিন ব্লাউজ পীসটা বদলাতে গেলুম—শান্তনুর সঙ্গে কোথায় দেখা করিস ?

—কোনো ঠিক নেই।

—তবু—

—কোনোদিন গড়িয়াহাটায় কোনোদিন লাইট হাউসের সামনে—

—তারপর কোথায় বেড়াতে যাস ?

—বেড়াতে আবার কোথায় যাবো। কোনো দোকানে গিয়ে খাবার টাবার খাই, তারপর কোনো কোনোদিন গঙ্গার ধারে—

—ও খুব সুন্দর কথা বলতে পারে, নারে? প্রফেসর যখন—

জয়শ্রী এবার না হেসে পারলো না। হাসতে হাসতে বললো, সুন্দর কথা আবার কি বলবে! তুমি বইতে যে রকম পড়ো ভেবেছো বুঝি সেই রকম—

—যাই বলিস, ছেলেরা খুব ভালো ভালো কথা বলতে না পারলে মেয়েরা সহজে মুগ্ধ হয় না। না হলে আর বিশেষত্ব কি আছে বল। শান্তনুর চেহারা অবশ্য ভালো, কিন্তু ওর চেয়ে সুন্দর চেহারার আরও তো ছেলে আছে, ওর চেয়ে বাড়ির অবস্থা ভালো, চাকরি ভালো করে—নিশ্চয়ই কথা দিয়েই ও তোকে একেবারে—

—শান্তনু একদম ভালো কথা বলতে পারে না। বেশ লাজুক আছে। তা ছাড়া, বেশির ভাগ দিনই তো অনুরাধা থাকে আমাদের সঙ্গে।

সুজাতা ভুরু দুটো অনেকখানি তুলে বললেন, অনুরাধা তোদের সঙ্গে থাকে? তোরা তিনজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাস?

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে?

—অনুরাধার সামনে তোরা ঐসব কথা বলিস?

—কি কথা?

ট্যাক্সির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সুজাতা বললেন, কি জানি বাবা, তোদের ব্যাপার-ট্যাপার—

জয়শ্রী বললো, কাকীমা, বিয়ের আগে তোমার চেনা ছিল না কারুর সঙ্গে?

ধ্যাৎ। আমাদের সময় কি আর তোদের মতন এমন স্বাধীনতা ছিল!

—সত্যি করে বলো।

—সত্যি না তো কি মিথ্যে বলছি নাকি? বাড়ির বাইরে কক্ষনো একা একা বেরুতে পারতাম না। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেত। স্কুলে যাবার সময় বাড়ির দারোয়ান যেত সঙ্গে, এমন কি কলেজে উঠেও—

—যাঃ, অত মোটেই ছিল না—

—তুই জানিস না! দাদা তোকে একটু বকুনি দিলেই তুই কেঁদে শেষ করিস, আর আমার বাবা—

রবীন্দ্র সদনে 'মায়ার খেলা'র টিকিট ফুরিয়ে গেছে। ফোয়ারার কাছে ও সিঁড়িতে বেশ ভিড়, দর্শকদের অধিকাংশই পরস্পরের চেনা, এ ওর কুশল সংবাদ নিচ্ছে। টিকিট না পেয়ে বেশ নিরাশ হয়ে গেল ওরা, তা ছাড়া

কোথাও তাড়াহুড়ো করে এসে টিকিট না পেলে কি রকম যেন একটু অপমান-জনক লাগে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিল, এখন আবার ট্যাক্সি পাওয়া মুশকিল। সুজাতা বললেন, তা হলে আর এক্ষুনি বাড়ি ফিরে কি হবে? চল্ মিঠু, এ দিকটায় একটু বেড়াই। কতদিন এ সব দিকে আসিনি।

জয়শ্রী বললো, চলো একটু হাঁটি। আমারও এখন বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কাকীমা তুমি ফুচকা খাবে?

—যাঃ, খেলেই যা অম্বল হবে!

—একদিন খেয়েই ছাখো না বাবা!

—ও কি মানুষ খায় নাকি? নোংরা নোংরা হাতে করে দেয়, নোংরা তেঁতুল গোলা জল—

—একটু নোংরা না হলে ওতে ঠিক টেস্ট হয় না, চলো ঐ দিকে।

দাঁড়া, একটু পরে—

রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছে দু'জনে। অনবরত গাড়ি। বেশ একটা মনোরম হাওয়া দিচ্ছে। এই সময় বাড়িতে বসে থাকার বদলে বেড়াতেই ভালো লাগে। ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের বাইরের প্রাঙ্গণে পুরু সবুজ ঘাস।

রাস্তা পেরুবার আগে সুজাতা হঠাৎ জয়শ্রীর দিকে ফিরে বললেন, মিঠু, তোকে একটা কথা বলবো, রাগ করবি না বল্?

সুজাতার এই ভঙ্গি বদলে জয়শ্রী খুব অবাক হয়ে যায়, উড়ন্ত পাখির ডানার মতন ভুরু দুটি তুলে জিজ্ঞাসা করলো, কি'?

—তুই তো যাকে বিয়ে করবি মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছিস? কেউ আর তোকে বাধাও দেবে না। কিন্তু তার আগে একজনের সঙ্গে একটু আলাপ করতে কোনো দোষ আছে?

—তার মানে?

—একজন তোর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চায়। এমনি একটু কথা বলবে। এ রকম তো কত লোকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হয়, হয় না?

—কে, কার কথা বলছো?

—আছে একজন! চল্, দুটো কথা বলবি শুধু, আমি তো আছিই। আমার কথা যদি শুনিস্, তুই তো শুধু একজনের সঙ্গেই মিশেছিস, তাকেই তোর পছন্দ হয়েছে, আরও দু'একজনের সঙ্গে মিশে একটু যাচাই করে দেখলে—

রাগে জয়শ্রীর মুখখানা লাল হয়ে গেল। তার সুন্দর মুখে আকস্মিক রাগ দেখা দিলে অনেকটা ইলেকট্রিক হিটারের মতন রং হয়। চোখ তীক্ষ্ণ করে

বললে, এর মানে কি? আমি তা হলে এক্ষুনি বাড়ি চলে যাচ্ছি। তুমি আসবে তো এসো—

সুজাতা তাঁর কন্যাপ্রতিম ভাসুরঝিকে অনুনয় করে বললেন, প্লীজ মিঠু, আমার জন্য অন্তত এখানে কোনো সীন করিস না—ভদ্রলোক রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি তোকে এনেছি—

দৃপ্তভঙ্গীতে মুখ তুলে জয়শ্রী বললো, কই? কোথায়?

রাস্তার ওপারে একটা হালকা সবুজ রঙের ফিয়াট গাড়িতে স্টিয়ারিং-এর ওপর হাত রেখে একজন সুবেশ পুরুষ নিঃশব্দে ধূমপান করছে। দৃষ্টি সামনে, ওদের দিকে নয়।

জয়শ্রী জিজ্ঞেস করলো, এই কি সেই?

—হ্যাঁ, সুগতবাবু, চল্ কথা বলে দেখবি খুব ভালো লোক—

গ্রীবা উঁচু করে কঠিন গলায় জয়শ্রী বললো, চলো। রাগে অপমানে জয়শ্রীর চোখ নাক কান জ্বালা করছে। লোকটা এতখানি নির্লজ্জ এখনো—। একে যদি উচিত শিক্ষা না দেওয়া যায়—

ওরা কাছে আসতেই সুগত অতিশয় সুসভ্য যুবা পুরুষের মতন দ্রুত নেমে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়ালো। অর্থাৎ গাড়ির আয়নায় সে ওদের লক্ষ্য করছিল। জয়শ্রী বললো, গাড়িতে উঠবো না।

সুগত নম্রভাবে বললো, কেন? উঠুন না, আমি নতুন গাড়ি চালাতে শিখেছি, আপনাদের একটু দেখাই!

যেন জয়শ্রীর সঙ্গে অনেক দিন ধরেই আলাপ, কোনো ইনট্রোডাকশনের দরকার নেই—সুগতর কথা বলার ভঙ্গি সেই রকম। যথারীতি সুগত ত্রুটিহীন সুরুচিসম্পন্ন পোশাক পরে আছে, তার চেহারার মতনই তার ব্যবহারে কোনো খুঁত নেই।

এখানে এসেই সুজাতা খানিকটা বদলে গেছেন, এখন আর জয়শ্রীর মেজাজকে যেন ভয় করার দরকার নেই। সুগত পেছনের দরজাই খুলে দিয়েছিল, সুজাতা বললেন, জয়শ্রী তুই সামনে বোস্।

কাকীমার দিকে তাকিয়ে জয়শ্রী চকিতে একবার বিদ্যুৎ হানলো। তারপর নিজেকে একটু সামলে বললো, কেন?

—বাঃ তোরাই তো কথা বলবি! আমি পেছনে বসছি।

—না—

সুগত সঙ্গে সঙ্গে বললো, আই সাজেস্ট আপনারা দুজনেই সামনে বসুন। দুজনেই পেছনে বসার বদলে—

সুজাতা বললেন, সেই ভালো। সামনে-পেছনে বসে গল্প করা যায় না। আপনি আমাদের গাড়িতে খানিকটা ঘুরিয়ে আনুন, তারপর আমাদের বাড়ির কাছে পৌঁছে দেবেন।

সুজাতা বসলেন ভেতরে, জয়শ্রী জানলার পাশে। সুগত ঘুরে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরলো। বসতে গিয়েই জয়শ্রী দেখলো পায়ের কাছে লোহার কি জিনিসপত্র পড়ে আছে। পায়ের কাছে এই সব থাকলে আবার ভালো করে বসা যায় নাকি! হয়তো ভদ্রলোক খেয়াল করেন নি, জয়শ্রীর বলার প্রবৃত্তি নেই।

স্টার্ট দিয়ে সুগত জিজ্ঞেস করলো, কোন্ দিকে যাবো বলুন?

সুজাতা বললেন, চলুন না যেদিকে হয়।

—তবু বলুন আপনারা—

—আপনার যেদিকে খুশী—

—আমার যেদিকে খুশী! যদি অনুমতি করেন, তা হলে আমি উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে কামরূপ, পশ্চিমে কচ্ছের রান—যে কোনো জায়গায় যেতে পারি!

—ওরেব্ বাবা, আপনার শখ তো কম নয়! চলুন বরং গঙ্গার দিকে খানিকটা-

জানলার বাইরে মুখ রেখে জয়শ্রী ভাবলো, তার কাকীমার ধারণা অনুযায়ী এই-ই বোধ হয় পুরুষদের চমৎকার কথা বলার নমুনা। ন্যাকা!

সুজাতা জয়শ্রীর দিকে ঠেলে বসেছেন। খুবই ঘেঁষাঘেঁষি। বললেন, আপনি নিজে ড্রাইভ করছেন কবে থেকে? আগের দিনও তো আপনার ড্রাইভার দেখেছিলাম।

-- ওকে গত সপ্তাহে ছাড়িয়ে দিলাম। শুধু শুধু রাখা হয়েছিল। আগের মাসে অফিসের কাজে দুর্গাপুর গেলাম, আমি নিজেই তো ড্রাইভ করেছিলাম। শুধু শুধু একটা লোককে কাজ না করিয়ে মাইনে দেওয়া—

হৃষীকেশ বা পরেশ কেউই অবশ্য নিজে গাড়ি চালান না! শেখারও চেষ্টা করেন নি। সুজাতারও এই ব্যাপারে একটু ভয় আছে।

কিছুদূর যাবার পর সুগত বিনীতভাবে বললো, মিস মুখার্জি কিছু কথা বলছেন না। বোধ হয় এখনো রেগে আছেন।

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে জয়শ্রী জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমার চিঠি পেয়েছিলেন?

উৎকট বিস্ময়ের সঙ্গে সুজাতা বললেন, সে কি তুই চিঠি লিখেছিলি নাকি? তোদের আগে দেখা হয়েছিল?

জয়শ্রী প্রায় এক ধমক দিয়ে বললো, কাকীমা তুমি চুপ করো তো, [illegible] ছিলেন আমার চিঠি ?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই উত্তর আশা করেন নি আমার কাছ থেকে।

—না, তা আশা করিনি। তবে অন্য কিছু আশা করেছিলাম।

আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি। আপনাদের বাড়িতে যেতে বারণ করেছিলেন, যাইনি। চিঠির কথাও কারুকে বলিনি। আপনিই তুললেন-

—বাড়িতে যাওয়া-না যাওয়ায় কিছু আসে যায় না।

—মিস মুখার্জি, আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি, তাহলে সেজন্য আমি এক্ষুনি ক্ষমা চাইছি। এবং এক্ষুনি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। তবে, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আপনাকে আমার একবার দেখার ইচ্ছে ছিল—আপনাকে আমার অ্যাডমিরেশন এবং কংগ্র্যাট্‌স জানাবার জন্য। আপনার যে-রকম কারেজ এবং ডিটারমিনেশন-বাঙালী মেয়েদের সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই-

দর্পিতা রাণীর মতন সম্পূর্ণভাবে স্বগতর দিকে ফিরে জয়শ্রী বললো, দেখা হয়ে গেছে তো! এবার আমাকে দয়া করে বাড়ি পৌঁছে দিন।

দু পাশ থেকে দুজনে কথা বলছে। মাঝখানে বসে সুজাতার অবস্থা করুণ। এবার কোনক্রমে নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে বললেন, এই মিঠ, তুই করছিস কি? সাধারণ একটু ভদ্রতা সভ্যতা—

—কাকীমা, তুমি তো জানোই আমার ভদ্রতা সভ্যতা জ্ঞান নেই।

স্বগত কোটের পকেট থেকে সিগারেটের কেস বার করে বললো, উইথ ইয়োর পারমিশন, আমি একটা সিগারেট ধরাচ্ছি।

সুজাতা বললেন, হ্যাঁ ধরান না।

—মিস মুখার্জি, আপনার আপত্তি নেই তো?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে জয়শ্রী বললো, না।

সিগারেটে প্রথম টান দিয়ে স্বগত অনেকখানি ধোঁয়া ছাড়লো। তার মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেছে। স্বগত আর সব কিছু সহ্য করতে পারে, কিন্তু কেউ তাকে অভদ্র অপবাদ দেবে, এটা যেন তার সহ্য হয় না। গাড়ি পড়েছে রেড রোডে।

জয়শ্রী দ্রুত ভেবে যাচ্ছে, কাকীমা কি আগের থেকেই জানতো যে, মায়ার খেলার টিকিট পাওয়া যাবে না? লোকটিকে কাকীমাই নিশ্চয় এখানে অপেক্ষা

করতে বলেছিল। আশ্চর্য ব্যাপার, বুড়ো বুড়ো লোকেরাও কি রকম ষড়যন্ত্র করতে পারে। নিজেরা যা পছন্দ করবে, যা ভালো বুঝবে, তা ছাড়া অন্য কারুর পছন্দ বা ভালো লাগা কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না।

সুগত একটু বিষণ্ণ গলায় বললো, মিস মুখার্জি যদি আমার সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা নিয়ে যান, তা হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। আমি রিয়েলি -

একবার রাগ হলে জয়শ্রীর মেজাজ কিছুতেই সহজে শান্ত হয় না। শ্লেষের সঙ্গে বললো, আপনার সম্পর্কে আমার কি ধারণা হলো বা না হলো, তা নিয়ে তো আপনার মাথা ঘামাবার দরকার নেই। তা ছাড়া, আপনার সম্পর্কে আমি কোনো ধারণা করতেই বা যাবো কেন!

সুগত তবু মৃদু হাস্যের প্রশংসার চোখে তাকালো জয়শ্রীর দিকে। কিছু একটা বলতে গেল, সেই সময় সুজাতা আবার বললেন, মিঠু, কি হচ্ছে কি! একটু চুপ করে বোস তো! চল্, তুই ফুচকা খাবি বলছিলি, গঙ্গার ঘাটে গিয়ে যত ইচ্ছে খাস, তাতে যদি তোর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। বড্ড জেদী মেয়ে, জানেন!

—কাকীমা, ফুচকা খাওয়ার আর একটুও ইচ্ছে নেই আমার। এবার বাড়ি গেলে হয় না?

—দাঁড়া। এ কি সুগতবাবু, পায়ের কাছে এ সব লোহালক্কড় কি রেখেছেন?

—কই!

সুগত নিচু হয়ে দেখতে গেল। আর তক্ষুনি খিদিরপুরের দিক থেকে একটা বিপুল চেহারার লরি হুড়মুড়িয়ে এসে পড়লো সামনে, সুজাতার চিৎকার, ভয়ার্ত মুখ তুলে সুগত স্টিয়ারিং ফেরালো, বাঁ দিক থেকে হলুদ বিদ্যুতের মতন একটা ট্যাক্সি, ক্রুদ্ধ পাঞ্জাবি ড্রাইভারের গালাগাল। তারপরই ধাক্কা। দোষ সুগতর ঠিক নয়, লরি ড্রাইভারেরই, কিন্তু ততক্ষণে ব্রেক কষার কর্কশ শব্দ, ধাতুর ঝনঝনানি, কাচ ভাঙা, ব্যাকুল রব। বিটের পুলিস দৌড়ে এলো, খেলার মাঠ থেকে সোরগোল তুলে লোকেরা দৌড়ে এলো, ট্যাক্সি ড্রাইভার লম্বা লম্বা পা ফেলে পালাতে লাগলো। সুগতর গাড়িখানা ট্যাক্সির পেটে ঢু-মারা।

[এই পরিচ্ছেদটি আমার এখানেই শেষ করা উচিত ছিল। এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু করা সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে। তা হলে পাঠকদের বেশ উৎকণ্ঠায় রাখা যায়, সেই রকমই নিয়ম। কিন্তু আমি অতটা নিষ্ঠুর হতে পারি

না। এখানেই জানিয়ে রাখি, দুর্ঘটনা খুব সাঙ্ঘাতিক নয়, কেউ মারা যায়নি, কিছু কিছু আহত অবস্থায় তিনজনেই হাসপাতালে। ট্যাক্সি ড্রাইভারও পালাতে সক্ষম হয়েছে।]

॥ ১৩ ॥

The garlands drift and turn
The young man runs, the maiden
runs, the young man runs

—অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের গান

হাসপাতালের ছোট ক্যাবিনটাতে বেশ ভিড়। তিন দিন কেটে গেছে, এখন ঘরের কারব মুখে সে রকম কোনো উদ্বেগের চিহ্ন নেই। ওদের কারুরই চোট খুব বেশী লাগেনি। সুগতর ডান হাতে জোর ধাক্কা লেগেছিল, তবে ফ্র্যাকচার হয়নি, কপালে কেটে গেছে অনেকটা। সুজাতার লেগেছে খুবই কম, সামান্য কেটে ছড়ে গেছে, এখন তিনি বাড়িতেই। জয়শ্রীরও আঘাত বেশী নয়, বাঁ পায়ের পাতায় লেগেছে খানিকটা, বাঁ দিকের গালে ও থুতনিতে ভাঙা কাচ ঢুকে গিয়েছিল।

কিন্তু জয়শ্রীকে নিয়ে অন্য ধরনের ভয় ছিল এই তিন দিন। শরীরের চেয়েও মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছে সে বেশী। না, স্মৃতি লোপ টোপের ব্যাপার নয়। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা সে কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলেনি। ডাক্তারের সঙ্গেও না। তারপর সে কথা বলছে, বাবা মা সবাইকে চিনতে পারছে, কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে একটি বা দুটি শব্দে। সব সময়ই যেন সে গম্ভীরভাবে চিন্তামগ্ন। মুখে তেমন বিষণ্ণতারও ছাপ নেই, যেন সব ব্যাপার সম্পর্কে উদাসীন।

আজ সে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। নার্স এসে যখন ব্যাণ্ডেজ বদলে দিয়ে যায়, তখন একবার জিজ্ঞেস করেছিল, মুখে দাগ থেকে যাবে, না? নার্স যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, এমন কিছু নয়, সামান্য একটু, তাও আস্তে আস্তে, আপনার সুন্দর চেহারা, কিচ্ছু বোঝা যাবে না! জয়শ্রী তখন সামান্য হেসেছিল। বিকেলে সে মাকে দেখেই বলেছিল, মা, আমার আর হাসপাতালে থাকতে ভালো লাগছে না। এমন কিছু তো হয়নি, আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো।

অলকা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তোর বাবা অফিস থেকে এক্ষুনি আসবেন, ওঁকে বলিস। কালই তোকে নিয়ে যাবো।

এখন হাসপাতালে সবাই এসেছেন। বসবার জায়গা নেই, সবাই দাঁড়িয়ে, ঘর উপচে কেউ কেউ বারান্দায়। জয়শ্রী আজও খুব বেশী কথা বলছে না। তবে সবার সঙ্গেই দুটি একটি কথা বলেছে, হেসেছে দু' একবার। মুখজোড়া ব্যাণ্ডেজ হলেও চোখ দুটি খোলা, চোখ দেখে মনে হয়, সে যেন এই ব্যাপারটা সম্পর্কে ভেবেচিন্তে একটা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কমলালেবু ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে কোয়াগুলো তার মুখে তুলে দিচ্ছেন অলকা। ঠোঁটের কাছে হাত রেখে বিচি বার করে নিচ্ছেন, যাতে জয়শ্রীকে মাথা তুলতে না হয়।

হৃষীকেশ, পরেশ ছাড়াও জয়শ্রীর মামার বাড়ির কয়েকজনও এসেছেন, নিম্ন গলায় কথা বলছেন তাঁরা। হৃষীকেশ বললেন, গুরুদেবের কথা শুনিনি! গুরুদেব আর কিছু বলতে চাননি, শুধু বলেছিলেন, মিঠুর একটা বিপদ আসছে —কিন্তু বিপদ যে এরকমভাবে আসবে…

নিজের অফিসের সহকর্মী এর সঙ্গে জড়িত তাই পরেশ দোষ কাটাবার জন্য তিন দিন ধরে প্রায় এক কথাই বলছেন। ফের বললেন, অ্যাকসিডেণ্টের ওপর তো আর মানুষের হাত নেই। ট্যাক্সি চাপলে, ট্রামে বাসে চড়লেও তো—সব সময় তো আর ঘরে বন্দী হয়ে থাকা যায় না।

জয়শ্রীর বড় মামা ভারী গলায় বললেন, তা তো বটেই! এর থেকে বেশী যে কিছু হয়নি, সেই জন্যই ভগবানকে ধন্যবাদ দাও! দুটো চোখ যে বেঁচে গেছে—

পরেশ বললেন, হ্যাঁ, ট্যাক্সির সঙ্গে না লেগে যদি লরির সঙ্গে—এই লরিওয়ালাগুলো যা হয়েছে আজকাল—

বড় মামা বললেন, হ্যাঁ এ তো কিছুই হয়নি। অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কেটে গেছে। পুরুষ মানুষের হলে তো কিছুই না, নেহাৎ মেয়ে সন্তান, সামান্য একটু দাগ থাকবে—তবে ওকে তাতেও খারাপ দেখাবে না—

হৃষীকেশ বললেন, সেজন্য আমি ভাবিই না!

সুজাতা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন জয়শ্রীর মামীমার সঙ্গে। যে-ঘটনা অন্তত পঞ্চাশবার বলা হয়েছে, সেটাকেই আরও একটু রোমহর্ষকভাবে বলছিলেন। বুঝলেন বৌদি, দৈত্যের মত ট্রাকটা কোথা থেকে যে এসে উদয় হলো, একেবারে সামনাসামনি আমি দেখতে পেয়েই যদি চেঁচিয়ে না উঠতাম—তা হলে কি যে হতো, উঃ—

অলকা এসে দাঁড়াতেই সুজাতা একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। এই কাহিনী

বার বার শুনেও অলকার কৌতূহল মেটে না। জিজ্ঞেস করলেন, লরিটা তবুও দাঁড়ালো না।

—কোথায় দাঁড়াবে! গ্রাহ্যই করলো না! পুলিস তো নম্বর নিতে পারেনি। সে-ই তো পুলিসের সিগন্যাল না মেনে—সুগতবাবুর তো দোষ নেই।

জয়শ্রীর মামীমা সুজাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বেশী লাগেনি তো?

শাড়ীর আড়ালে সুজাতার দু-এক জায়গায় ষ্টিকিং প্লাস্টার লাগানো, প্রকাশ্যে কোনো ক্ষত নেই। বললেন, না, আমার প্রায় কিচ্ছুই হয়নি। মিঠি পাশে বসেছিল তো, বাবা, ভাবলেও এখনো বুক কাঁপে—

—আর ইয়ে, সেই ভদ্রলোকের—

—সুগতবাবুর লেগেছে খুব, কিন্তু তার চেয়েও বেশী, উনি একেবারে মরমে মরে আছেন। উনি ভাবছেন, ওঁর জন্যই। উনি বারবার বলছেন, আমি সব রকম দায়িত্ব নিতে রাজি আছি—

অলকা বললেন, ওঁকে একবার দেখতে যাবো। ওঁর কি দোষ! মিঠি, আমার সঙ্গে বেরুলেও তো হতে পারতো। আমাদের ড্রাইভারটা যা বিশ্রীভাবে চালায়, কতবার বলেছি,—

মামীমা বললেন, সেবার আমরা যখন জামসেদপুরে যাচ্ছিলাম—

এই গল্প কিছুক্ষণ চলার পর মাঝপথে সুজাতা নিচু গলায় ডাকলেন, দিদি। তাঁর দৃষ্টি বারান্দার অন্যপ্রান্তে। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালেন অলকা। শান্তনু হেঁটে আসছে এই দিকে। যেন কোনো একজন ভয়ঙ্কর শত্রু অস্ত্র হাতে নিয়ে আসছে, এইভাবে তাকিয়ে রইলেন ওঁরা।

শান্তনু সামনে এসে দ্বিধাহীন গলায় বললো, আমি একটু জয়শ্রীর সঙ্গে দেখা করবো।

কেউ কোনো উত্তর দিলেন না। সিমলায় শান্তনুর সঙ্গে অলকা এবং সুজাতার আলাপ হয়েছিল, অনেক কথা বলেছিলেন তখন, এখন কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না।

শান্তনু আবার বললো, আমি জয়শ্রীর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। ও জেগে আছে তো?

অলকা সামান্য মাথা হেলিয়ে প্রায় অস্ফুট গলায় বললেন, আছে।

শান্তনু ক্যাবিনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। জয়শ্রীর বাবা-কাকারা এমন-ভাবে দাঁড়িয়ে যে শান্তনুকে অনুমতি নিতে হয়ই। সেখানেও সে একই রকম গলায় বললো, আমি একটু জয়শ্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কথাবার্তা থামিয়ে সেখানকার ব্যক্তিরা চুপ করে গেলেন। কেউ কোনো

উত্তর দিলেন না, তবে রাস্তা ছেড়ে দাঁড়ালেন। শান্তনু এগিয়ে গেল জয়শ্রীর খাটের দিকে, বড়মামা হৃষীকেশের দিকে প্রশ্নবোধক চোখ নেড়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, কে? যেন একটা দারুণ অপমানজনক ব্যাপাব, এই ভাবে চোখ নিচু করলেন হৃষীকেশ।

জয়শ্রী দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়েছে। সে কি শান্তনুর গলাব আওয়াজ শুনতে পায়নি? শান্তনু আশা করেছিল, জয়শ্রী তার গলা শুনেই ধড়মড় করে উঠে বসবে। অথচ তার পিঠ ফিরিয়ে থাকার মধ্যে কি তীব্র অভিমান!

শান্তনু কাছে গিয়ে আস্তে ডাকলো, জয়শ্রী!

কোনো সাড়া নেই।

এবাব একটু জোবে, জয়শ্রী!

এবারও কোনো সাড়া নেই।

—জয়শ্রী, আমি শান্তনু!

শুয়ে থাকাব ভঙ্গি দেখেই বোঝা যায় মানুষ ঘুমন্ত কিনা। শান্তনু বেশ বুঝতে পারছে, জয়শ্রী জেগে আছে কিন্তু কোনো সাড়া না পেয়ে অপমানে শান্তনুর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগলো। সে বেপরোয়া সাহস নিয়ে চলে এসেছিল এখানে, নিশ্চিত হয়েছিল, জয়শ্রী তার এক ডাকে সাড়া দেবে, তখন শান্তনু ওর বাবা মায়ের উপস্থিতি বা ভ্রূকুটি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কথা বলে যাবে। জয়শ্রী আহত হয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছে, আর সে আসবে না?

তিনবারেও সাড়া না পেয়ে শান্তনু হাত বাড়িয়ে জয়শ্রীর পিঠে ছোঁয়াতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে আনলো হাতটা। রীতিমতন নার্ভাসভাবে মুখ ফিরিয়ে অনর্থক প্রশ্ন করলো, ঘুমিয়ে আছে বুঝি?

এবারও কারুর কোনো উত্তর দেবার প্রয়োজন নেই।

শান্তনু আবার মুখ ফেরালো। গলায় জোর এনে জিজ্ঞেস করলো, জয়শ্রী আমি শান্তনু, তুমি এখন কেমন আছো?

পিঠ না ফিরিয়ে খুব সংক্ষিপ্তভাবে জয়শ্রী বললো, ভালো আছি।

—জয়শ্রী শোনো—

অর্থাৎ শান্তনু বলতে চায় জয়শ্রী তুমি একবার অন্তত মুখ ফেরাও। কিন্তু মুখ ফিরলো না, দেয়ালের দিক থেকে উত্তর এলো, তুমি যাও!

এ রকম নিষ্ঠুর কোনো বাক্য শান্তনু জীবনে আর কখনো শোনেনি। সে কি এখানে এসে কোনো ভুল করেছে? কি ভুল? ঠিক আর চারদিন বাদে রেজিস্ট্রি হবার কথা ছিল, এখন আবার দেখা করতে আসায় ভুল কি?

ঘরে অন্য লোকের উপস্থিতির জন্য শান্তনু ক্রমশই বেশী বিচলিত হয়ে পড়তে লাগলো। পুরুষদের জন্য 'ধরণী দ্বিধা হও'এর পরিপূরক কোনো ব্যাপার নেই, তাদেরও কখনো কখনো এই রকম অবস্থায় পড়তে হয়। তার এক্ষুনি এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত না আরও দাঁড়িয়ে থাকা উচিত, সেটাও বুঝতে পারছে না।

এক হিসেবে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন জয়শ্রীর বড মামা। তিনি মিষ্টি গলায় অপমানজনক ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, আমার মনে হয়, ওকে এখন ডিসটার্ব না করাই ভালো।

অত্যন্ত ক্যাবলার মতন বিনীত হয়ে গিয়ে শান্তনু বললো, আচ্ছা, ঠিক আছে। আই অ্যাম সরি।

মাথা নীচু করে বেরিয়ে গেল শান্তনু। বারান্দা পেরিয়ে গিয়ে যতক্ষণ না সিঁড়িতে নামলো, তার মনে হলো, কতগুলো উপহাস মাখা চোখের দৃষ্টি তীরের মতন তার পিঠে বিঁধছে। জয়শ্রী একবারও তার দিকে তাকায়নি। একবার যদি তাকাতো, তাহলে পৃথিবীটা কত সুন্দর হয়ে যেত।

॥ ১৪ ॥

'হার মানা হার পরাবো তোমার গলে'

—রবীন্দ্রনাথ

—জয়শ্রী, তুই এটা কি করলি?

—ঠিকই করেছি রে!

—তুই কি পাগল হয়ে গেলি? এ রকম ঝোঁকের মাথায়—

—সবাই আমাকে ঐ এক কথা বলে। আমি সবই নাকি ঝোঁকের মাথায় করি।

—তুই এখনো যদি

জয়শ্রী হাসতে হাসতে বললো, এখন আর কিছুই করার নেই। আমার বিয়ের চিঠি ছাপা হয়ে গেছে। তোর চিঠি কিন্তু এখানে দেবো না, তোর বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসবো। তোর বাবা মা সবাইকেই আসতেই হবে!

একগাদা নতুন জামা কাপড়ের প্যাকেট মেঝেতে ছড়ানো, জয়শ্রী তার মাঝখানে বসে আছে। অনুরাধা বসেছে চেয়ারে। আর এগারো দিন বাদে সুগতর সঙ্গে জয়শ্রীর বিয়ে। জয়শ্রী সম্পূর্ণ সেরে গেছে। তার চিবুকের কাছে একটা কাটা দাগ একটু লক্ষ্য করলে চোখে পড়ে, এতে তার চিবুকের ডৌলটি

সামান্য একটু চওড়া হয়ে গেছে। তার বাঁ চোখ থেকে একটু নিচে কাটা দাগটি অবশ্য বেশ স্পষ্ট, এতে জয়শ্রীর রূপের খুব যে হানি হয়েছে তা বলা যায় না, তবে মুখের চেহারাটা বদলে গেছে খানিকটা। তার জেদী ভাবটা আরও ভালো করে ফুটে উঠেছে। এটা একধরনের টমবয়ইস রূপ। আর কিছু দিন বাদে লোকে যখন মোটর দুর্ঘটনার কথাটা ভুলে যাবে, তখন তাকে দেখলে মনে হবে, ছেলেবেলায় দুরন্তপনার কিংবা পেয়ারা গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার ঐ চিহ্ন।

জয়শ্রী বললো, কাল আমার বেনারসীটা কিনতে যাবো, তুই আমার সঙ্গে মার্কেটে যাবি?

—না।—

—তোকে যেতেই হবে।

—তুই কেন এরকম করলি, সে কথা আমাকেও বলবি না।

—বলার কি আছে! যা স্বাভাবিক, তাই তো করছি!

—এটা স্বাভাবিক! তাহলে আগে যা করেছিলি তা অস্বাভাবিক ছিল?

—হয়তো তাই! তুই কাল দুপুরে বাড়িতে থাকবি তো? তোকে আমি বাড়ি থেকে তুলে নেবো, আমার সঙ্গে মার্কেটে যাবি।

—না, আমি যাবো না! শোন—

—তুই আমাকে যেটা প্রেজেন্টেশন দিবি, সেটাও কিনতে যাবি না?

—তোকে আমি ছাই দেবো। তোর বিয়েতে আমি আসবোই না।

—তোর ঘাড় আসবে। তুই যদি না আসিস, আমি ছাঁদনাতলা থেকে উঠে গিয়ে তোকে হিড়হিড় করে টেনে আনবো।

—মাথা ঠাণ্ডা করে একটা কথা শোন্ তো! শান্তনু শুধু একবার তোর সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোর মুখ থেকে কথাটা শুনতে চায়। তুই একবার অন্তত ওর সঙ্গে দেখা করবি?

—বিয়ের কার্ড পাঠাবো, সেদিন আসতে বলিস!

—বাজে বকিস না তো! তুই দেখা করবি না?

ছেলেমানুষের মতন মুখ করে ঠোঁটে টেপা হাসি নিয়ে জয়শ্রী বললো, এ পোড়া মুখ আর তাকে জীবনে দেখাবো না, সখী!

—এই পোড়া মুখ দেখলেই সে ধন্য হয়ে যাবে! ঐ মুখখানি দেখার জন্য সে যে জ্বলে পুড়ে মরছে!

গালের কাটা জায়গাটায় আঙুল রেখে জয়শ্রী বললো, যে জয়শ্রীকে সে চিনতো, সে জয়শ্রী আর নেই। তার ঘরের আয়নায় যে মুখখানির ছবি আছে, সে তো এ মুখ নয়!

—তুই মাঝে মাঝে এমন পাগলের মতন কথা বলিস না, যে বড্ড রাগ হয়। তোর কি হয়েছে কি? ঐটুকু কেটে গেছে—ওতে তো মুখখানা আরও সুন্দর হয়েছে।

মুখের ভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল জয়শ্রীর। কয়েক মুহূর্ত সে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো অনুরাধার দিকে। মনে হলো, এক্ষুনি তার চোখে জল আসবে। তার বদলে হিস্টিরিয়া রুগীর মতন হা-হা করে হেসে উঠে বললো, ছাখ অনুরাধা, আমাকে করুণা করতে আসিস না। লোকের কাছ থেকে করুণা নেবার অভ্যেস আমার নেই। বরং আমি আত্মহত্যা করবো, তবু—

—এর মধ্যে করুণা করার প্রশ্ন কোথায়! তুই আয়নায় ছাখ না গিয়ে। সামান্য একটু কাটা দাগ,—শান্তনু কি বলেছে জানিস, ও বলেছে, জয়শ্রী যদি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়েও ফিরে আসতো, তাহলেও শান্তনু—

ক্রোধচঞ্চলা নয়নে জয়শ্রী এক ধমক দিয়ে বললো, চুপ কর! আর কোনো দিন এসব কথা বলবি না আমার কাছে! দয়া! ও আমাকে দয়া দেখাতে চায়! আমি যা করেছি, তা আমি নিজের দোষেই করেছি, কিন্তু তবুও আমি কারুর কাছে অনুতপ্ত হয়ে থাকতে পারবো না। বরং যে এই ঘটনার জন্য আমার কাছে অনুতপ্ত থাকবে, যাকে আমি দয়া দেখাতে পারবো, তাকেই আমি—

অনুরাধা আস্তে আস্তে বললো, শুধু কি দয়া দেখানো বা না দেখানোই বড় কথা? ভালোবাসা বলে কিছু নেই?

—এসব ব্যাপারের কাছে ভালোবাসাও হেরে যায়!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপতে গিয়েও চাপতে পারলো না অনুরাধা। বললো, আমি উঠি। শান্তনু দাঁড়িয়ে থাকবে। তাহলে বলবো ওকে, তুই আর ওর সঙ্গে দেখা করবি না?

—না!

—আমি চললাম।

—বোস্। ঐ ড্রয়ারটা খোল্। ওর মধ্যে ওর একটা চিঠি আছে। পড়্। অবশ্য এর উত্তর আর তোকে লিখতে হবে না। ওকে বলে দিস্, আর যেন আমাকে চিঠি-ফিটি না লেখে।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়লো অনুরাধা। তারপর আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে বললো, একটা মানুষকে এরকম কষ্ট দিতে পারলি তুই!

—ওসব কষ্ট দুদিনে ভুলে যাবে। তাছাড়া, একজন কষ্ট পেলে কি আর করা যাবে, আরও কত লোক যে খুশী হলো! বাবা আর মা'র মুখ দেখেছিস? মনে হচ্ছে না, দুজনেরই বয়েস অনেক কমে গেছে! কাকা আর কাকীমাও

খুশী, ওদের কথাই থাকলো শেষ পর্যন্ত। যে বিয়ে করছে সেও খুশী, কারণ তার আর অপরাধবোধ থাকবে না! শুধু একজন কষ্ট পেলে আর কি করা যাবে! বিয়ের দিন কত আত্মীয়স্বজন আসবে, কত আনন্দ হবে, ম্যারাপ বাঁধা হবে, সানাই বাজনা হবে,—কত ভালো বল্ তো। এর বদলে চোরের মতন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে চুপিচুপি বিয়ে করা—

—এ সব আগে বুঝতে পারিস নি কেন? মাসীমা তো কত বলেছিলেন!

—তখন ভুল করেছিলুম! সবাই কি সব কথা ঠিক সময়ে বুঝতে পারে? বুঝলি না, সেই অ্যাকসিডেণ্টে মাথায় ঝাঁকুনি লেগেই আমার মাথাটা ঠিক হয়ে গেল! হা-হা-হা—

কথাগুলো এত জোর দিয়ে বলছে বলেই বোঝা যায়, এগুলো জয়শ্রীর মনের কথা নয়। তবু সে তার মনকে এগুলোই বোঝাবার চেষ্টা করছে।

—জয়শ্রী, আমি এবার উঠি রে!

—শোন্ না! এইরকম বিয়ে না হলে এত জিনিসপত্তর পেতাম! এই গ্যাখ, এই শাড়ীটা জাপান থেকে ইম্পোর্টেড, এটা কাশ্মীরী সিল্ক, এই ব্রোকেডটা, এই পারফিউম সেটটা—

হাত দিয়ে বাক্সগুলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিয়ে জয়শ্রী বললো, এ সব কিচ্ছু পেতাম না! কিচ্ছু না। আমি এখন কতরকম যে গয়না চেয়ে নিচ্ছি—বিয়ের সময় গয়না টয়না না পেলে মেয়েদের ভালো লাগে? দেখবো, তোর বিয়ের সময় তুই কি রকম—

হঠাৎ মুখ তুলে জয়শ্রী বললো, 'চেয়ারে বসে আছিস কেন? নিচে নেমে বোস্ না! আমার জিনিসগুলো দেখবি না?

—না রে আমি এবার যাই।

করুণভাবে অনুনয় করে জয়শ্রী বললো, এখন যাসনি, একটু গ্যাখ ভাই! কারুকে না দেখালে কি আনন্দ হয়!

অনুরাধা নেমে এলো, প্রথম প্রথম অমনোযোগের সঙ্গে জয়শ্রীর জিনিসগুলো দেখতে লাগলো। তবে শাড়ী গয়না এসব দেখতে দেখতে মেয়েদের এক ধরনের দুর্নিবার আকর্ষণ এসেই যায়, অনুরাধাও তা এড়াতে পারলো না।

জয়শ্রী বললো, তোর সঙ্গে তো ওর এখনো আলাপ হলো না। তুই যা ভাবছিস, তা কিন্তু নয়, সুগত রায় চৌধুরী ওর থেকে কোনো অংশে খারাপ নয়। খুব ভদ্র আর ডিসেণ্ট—

—তা তো হতেই পারে!

—তুই কাল আসবি তো! তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

—বিয়ের দিনই তো আলাপ হবে।

—তুই বিয়ের দিন আমাকে সাজিয়ে দিবি তো?

—দেবো।

—অনুরাধা, এদিকে ছাখ।

জয়শ্রীর গলার আওয়াজ এমন বদলে গেছে যে অনুরাধা চমকে উঠলো। স্মৃতির ম্লান বিষণ্ণতায় ছেয়ে আছে তার মুখখানা।

একখানা দামী শাড়ীর ওপর বাঁ পা খানা তুলে জয়শ্রী ক্যাকাশে ভাবে হেসে বললো, কড়ে আঙুলটা ছাখ্।

জয়শ্রীর বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা থেঁতলে একটু বিকৃত হয়ে গেছে। নখটা নেই, সামনের দিকটা গোলমতন হয়ে আছে, ওখানে অপারেশন হয়েছিল।

—এটা কবে হলো?

—সেই অ্যাকসিডেন্টের সময়ই। আমার পায়ের আঙুলগুলো এক সময় খুব সুন্দর ছিল না রে?

—এখনো সুন্দর আছে। একটা আঙুল তো— ও তো অনেক সময় হোঁচট খেলেও হয়। আবার দেখিস অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে।

—ঠিক হবে না।

—বলছি দেখিস, নখ উঠলেই অনেকটা ঠিক হয়ে যাবে। পুরোপুরি না হলেও ওতে কিছু যায় আসে না। ঢাকা জুতো পরলে—

অদ্ভুত ধরনের রহস্যময় হাসি হেসে জয়শ্রী বললো, অনেক কিছু যায় আসে, তুই বুঝবি না।

সাদার্ন এভিনিউর কৃষ্ণচুড়া গাছটার তলায় অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল শান্তনু। অনুরাধা আস্তে আস্তে তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

শান্তনু জিজ্ঞেস করলো, কি?

—জয়শ্রী আসবে না।

—আর কোনোদিনই আসবে না?

—না।

শান্তনুর মুখের একটা রেখাও বদলালো না। অনুরাধার চোখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করলো। তারপর খুব নির্লিপ্তভাবে বললো, যাক্ গে। আমার অনেকটা দেরী হয়ে গেল, এক জায়গায় যেতে হবে। অনুরাধা তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম—

—না, না, আমার আর কষ্ট কি –

–আমার জন্যই তো তুমি বার বার—যাক গে, আমি দুঃখিত খুব সেজন্য। তুমি এখন কোনদিকে যাবে ?

—বাড়ির দিকে।

—তাহলে তো তোমাকে পৌঁছে দিতে পারছি না। আমি অন্যদিকে যাবো। চলি আজকে। পরে কোনোদিন যদি তোমার সঙ্গে দেখা করি, তোমার আপত্তি নেই তো ?

উত্তর না দিয়ে অনুরাধা হাসলো শুধু।

॥ ১৫ ॥

And our name has a seat
Though the shroud should
be donned!
O Life, O Beyond,
Thou art strange, thou art sweet!

—Mrs. E. B. Browning

শান্তনু অস্বস্তির সঙ্গে বললো, এই কলকাতা শহরে কোথাও একটু নির্জন জায়গা নেই, যেখানে বসে আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি।

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে অনুরাধা ময়দানের দিকে হাত দেখিয়ে হাসতে হাসতে বললো, এই তো এত বড় ময়দানটা খালি পড়ে আছে।

ভুরু কুঁচকে আছে শান্তনুর, ময়দানের গম্ভীর শোভার দিকে তাকিয়েও আর ভুরু সোজা হলো না। বললো, সব জায়গাতেই তো মানুষ।

—হঠাৎ মানুষের প্রতি আপনার এত বিরক্তি এলো কেন ?

—ঠিক বিরক্তি নয়। তবে যেখানেই যাই, মনে হয় লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পিঠ ফেরালেই ওরা হাসবে।

অনুরাধা বললো, উঁহুঃ, এ লক্ষণ তো ভালো নয়! এ সব মাথা থেকে মুছে ফেলুন।

—চেষ্টা করছি। পারছি না।

—লোকে আপনাকে দেখেই ব্যর্থ প্রেমিক বলে চিনে ফেলেছে! চেহারা দেখলেই বোঝা যায়! কই দাড়ি রাখেন নি তো, চুলও তেমন উস্কোখুস্কো নয়!

—ব্যর্থ প্রেমিক নয়, পরাজিত মানুষ। আজ আমি বুঝতে পারছি, প্রেমে ব্যর্থ হলে কেন অনেক ছেলে আত্মহত্যা করতে চায়।

—রক্ষে করুন। আত্মহত্যা-টত্যা করার প্ল্যান আছে নাকি আপনার ?

শান্তনু অন্যমনস্কভাবে হাসলো। তারপর বললো, না, সেরকম ইচ্ছে আমার নেই। তবে আমি বুঝতে পেরেছি, কেন আত্মহত্যা করে। মেয়েটিকে না-পাবার জন্য নয়, পৌরুষের অপমানের জন্য। এই ব্যর্থতা, এতবড একটা অপমান—

—কিন্তু আপনি তো হেরে যাননি। জয়শ্রীই হেরে গেল শেষ পর্যন্ত। ওই তো ভালোবাসার সম্মান রাখতে পারলো না, মনের জোর রইলো না—

—ভালোবাসার চেয়েও মানুষের অহংকার বড। তোমার তা-ই মনে হয় না ?

—হয়তো তাই। আমি ঠিক জানি না।

শান্তনু বললো, কোনো দোকান-টোকানে বসতে ভালো লাগছে না, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেও ভালো লাগছে না। চলো, ময়দানের মধ্যে একটু বেড়াবে। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলা যাবে।

—চলুন।

—তোমাকে আমি মাঝে মাঝে এরকম ডেকে আনি। তুমি কিছু মনে করো না তো ?

—মনে করলেই বা কি হবে !

—তা ঠিক। তুমি এত ভদ্র, তুমি তো আর মুখে কিছু বলবে না। আগে তুমি তো তোমার বান্ধবীর জন্য আর আমার জন্য অনেক সময় নষ্ট করেছো—কিন্তু এখন তো তোমাকে ডাকার কোনো মানে হয় না।

—গ্রীন সিগন্যাল দিয়েছে, আমরা কি রাস্তা পার হবো ?

—হ্যাঁ, চলো।

গান্ধী-মূর্তির পাশ দিয়ে ওরা হেঁটে যায় রেড রোডের দিকে। কোনো একটা বড মিটিং ভেঙেছে একটু আগে, তাই আজ এসব এলাকায় সত্যি বেশ ভিড়। এত ভিড় শান্তনুর পছন্দ হচ্ছে না। চলন্ত জনস্রোতের দিকে তাকিয়ে শান্তনু বললো, এই যে এত লোক যাচ্ছে, এদের সবারই কি জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে? মিটিং শুনতে এসেছে যখন, নিশ্চয়ই একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু আমার তো কোনোই উদ্দেশ্য নেই মনে হয়। সত্যি অনুরাধা, এক সময় এমন মনে-হয় যে সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করে দিই !

অনুরাধা কিছু উত্তর না দিয়ে হাসলো।

—হাসছো কেন?

—এমনিই!

—আমি বড্ড বাজে বকছি, তাই না? আমি শুধু নিজের কথাই বলে যাচ্ছি। আমি এরকম ছিলাম না। তোমাকে ডেকে এনে শুধু শুধু—। আচ্ছা, অনুরাধা, এবার তোমার কথা বলো।

—আমার আবার কি কথা?

—তোমার কি কোনো কথাই নেই? তুমি কি আমাকে বন্ধু হিসেবে নিতে পারো না?

—বাঃ, আমার কোনো কিছু বলার না থাকলেও কি বলবো?

—আমি বিশ্বাস করি না। আমার তো কখনো খুব মন খারাপ হলে তোমার কাছেই, মানে, আগেও তো জয়শ্রীর চেয়ে তোমার সঙ্গেই বেশী দেখা হয়েছে—

—চলুন, ঐখানে ঘাসের ওপর বসবেন?

ঘাসের ওপর বসা গেল না, কেন না, ঘাস ভিজে। চটি খুলে পা দিয়ে ভিজে ঘাস স্পর্শ করে অনুরাধার খুব ভালো লাগলো। ছেলেমানুষের মতন খালি পায়ে ভিজে ঘাসের ওপর খানিকটা হেঁটে বললো, ইস, কতদিন যে এরকমভাবে খালি পায়ে—আমাদের এলাহাবাদের বাড়িতে সামনে খানিকটা মাঠ ছিল, সেখানে খুব—

—তোমরা এলাহাবাদে কতদিন ছিলে?

—অনেকদিন। দশ বারো বছর।

—এলাহাবাদের গল্প বলো। তোমার সম্পর্কে কিছু জানতে ইচ্ছে করে। তুমি সব সময় নিজের ব্যাপারটা এমন রহস্যময় করে রাখো—

অনুরাধা হাসিমুখে ঔদাসীন্য মাখিয়ে বললো, আমার কোনো গল্প নেই! চলুন, এখানে তো বসা যাবে না—

—তোমাকে কি এক্ষুনি বাড়ি যেতে হবে?

—গেলেও হয়। না গেলেও খুব ক্ষতি হবে না।

—তোমাকে বাড়ি থেকে খুব স্বাধীনতা দেয়, না?

—স্বাধীনতা তৈরী করে নিতে হয়। তাছাড়া, নানা কারণে, বাড়ির বাইরেই বেশীক্ষণ থাকতে আমার ভালো লাগে।

—কি কি কারণে?

—নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার। শুনতে আপনার ভালো লাগবে না।

—গঙ্গার দিকে গেলে কেমন হয়? আমি কি তোমাকে বেশী জোর করছি? আমার মনটা একদম স্বস্থির নেই!

গঙ্গার দিকে দুজনে এখন মুখ করে তাকিয়ে। এখনেও অনেক লোক, তবে কেউ কারুর দিকে লক্ষ্য করছে না। মাঝে মাঝে কিছু ছেলে দল বেঁধে এসে খুব কাছাকাছি থেকে দেখে যাচ্ছে, কোনো ছেলে কোনো মেয়ের গায়ে হাত রেখেছে কি না। এরা শহুরে সমাজের অনিযুক্ত অভিভাবক।

অনুরাধা বললো, জয়শ্রীর সঙ্গে গত সোমবার দেখা হয়েছিল।

শান্তনু বললো, থাক।

অনুরাধা তবুও বললো, ওরা কাশ্মীর গেল হনিমুন করতে।

শান্তনু অপরাধীর মতন হেসে বললো, আমার কিন্তু আর দুঃখ হচ্ছে না, কিংবা রাগও হচ্ছে না। তোমাকে যদি একটা কথা বলি, তুমি বিশ্বাস করবে? জয়শ্রীর মুখখানাও আমার এখন ভালো করে মনে পড়ে না।

—যাঃ মিথ্যুক!

সত্যি, বিশ্বাস করো। এক একবার মনে পড়ে, আবার মিলিয়ে যায়। কিরকম যেন ধোঁয়াটে হয়ে এসেছে। আমার মনে হয়, আমি জয়শ্রীকে কখনো ঠিক ভালোবাসিনি।

—ও কথা বলবেন না! তাতে সব কিছুই মিথ্যে হয়ে যায়।

—ভেবেছিলাম ঠিকই, ঠিক জয়শ্রীকে নয়, ওর ঐ সুন্দর চেহারা, তেজী স্বভাব—সব মিলিয়ে একটা আইডিয়া—সেটা জয়শ্রী সম্পর্কে যতখানি সত্যি, তার চেয়েও বেশী আমার মনে মনে তৈরী করা। জয়শ্রীর মন আমি কখনো ঠিক বুঝতে পারিনি। ওর সঙ্গে তো সেভাবে ঠিক কথাই হয় নি, যা কিছু কথাই সব চিঠিতে। তবে খুব সুন্দর চিঠি লিখতো জয়শ্রী, দ্যাট আই মাস্ট অ্যাডমিট—আমাকে আর ও রকম চিঠি কেউ লিখবে না—

অনুরাধা বললো, ঐটা কোন্ দেশের জাহাজ বলুন তো? কি সুন্দর রং দেখেছেন? মনে হচ্ছে একদম নতুন।

শান্তনু হাসতে হাসতে বললো, এই জন্যই তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে! তুমি ঠিক সময় কথা ঘুরিয়ে নিতে পারো। পাছে আমি এক কথা বার বার বলে মন খারাপ করি—

অনুরাধা আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে বললো, দেখুন, আপনাদের ব্যাপারটা ভেঙে যাওয়ায় আমারও খুব মন খারাপ হয়েছে। আমিও যেন একটা বাজি ধরে হেরে গেছি।

—কিসের বাজি?

—আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না। আমার ধারণা ছিল, পৃথিবী থেকে ভালোবাসা শেষ হয়ে গেছে। শুধু আপনাদের দেখেই মনে হয়েছিল আপনারাই একমাত্র—আপনারা সুখী হলে আমি হয়তো আবার বিশ্বাস ফিরে পেতাম। কিন্তু জয়শ্রী আমাকে হারিয়ে দিল।

—ভালোবাসার ওপর একটুও বিশ্বাস নেই তোমার ?

—না।

—এটা তোমার ভুল অনুরাধা। ভালোবাসতে গিয়ে মানুষ বার বার ভুল করে, তবু ভালোবাসা আছে। আমার এ বিশ্বাস নষ্ট হয়নি।

ভালোই তো, আপনি আবার সুখী হবেন।

তোমার এরকম অবিশ্বাস কেন ?

—চলুন, এবার ফিরলে হয় না ?

—বুঝেছি, উত্তর দেবে না। আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, জয়শ্রী কি সত্যি আমাকে কখনো একটুও ভালোবাসতো ? না কি সবটাই ওর নেশা ? নইলে, সামান্য একটা দুর্ঘটনার জন্য—

—আমি জয়শ্রীকে বুঝতে পারিনি।

সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে শান্তনু বললো, আমি কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি।

—আবার চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন ?

—ঠিক চাকরি ছাড়ছি না। আমাদের অফিসেরই একটা ব্রাঞ্চ আছে বোম্বেতে, সেখানে ট্রান্সফার নেবার ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর হয়তো বিদেশে—

—বিবাগী হয়ে যাবেন ?

—হ্যাঁ। বিবাগী হয়ে যাওয়াই ভালো। কি আর করি বলো!

—গায়ে ছাই মেখে লোটা কম্বল নিয়ে বেরুলে আরও ভালো হতো!

কিছুক্ষণ হাসাহাসিতে আবহাওয়া হাল্কা হয়ে যায়। এবার ফেরার সময়। ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে করতে শান্তনু বললো, তোমাকে মাঝে মাঝেই ডেকে বিরক্ত করতাম। আর করবো না।

—আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন। আমি কি একবারও বলেছি যে আমি বিরক্ত হই।

—কিন্তু তুমি নিজে থেকে কোনো কথা বলো না, আমিই যা কিছু বলি!

—এখন আপনারই তো বলবার সময়।

—যাক্। আর তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। তোমাকে যদি চিঠি লিখি, তুমি উত্তর দেবে ?

—এই সেরেছে। আমি যে একদম চিঠি লিখতে পারি না। চিঠি লিখতে গেলেই আমার কলম ভেঙে যায়।

তার মানে, তুমি চাও যে আমি তোমাকে চিঠি না লিখি। ঠিক আছে, লিখবো না।

আমি ঠিক তা বলিনি।

বুঝতে পেরেছি। বম্বেতে তো তোমার এক দাদা কাজ করেন—কখনো যদি তাঁর কাছে যাও, তাহলে দেখা হতে পারে।

কেন, আর কলকাতায় ফিরবেনই না?

খুব শিগ্‌গীর অন্তত নয়। যাবার আগে একটা কথা বলে যাই। ক'দিন ধরে আমি একটা জিনিস খুব ভালভাবে বুঝতে পারছি। এখান থেকে চলে গেলে, জয়শ্রীর অভাব কতখানি অনুভব করবো জানি না। কিন্তু তোমার অভাব খুব অনুভব করবো। তোমার সঙ্গেই তো আমার বেশী কথা হতো আমার কি মনে হয় জানো? আমি হয়তো জয়শ্রীকে কখনো ঠিকভাবে ভালোবাসিনি। আমি আসলে তোমাকেই—

ঝট করে মুখ ঘুরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে অনুরাধা বললো, তার মানে কি?

জয়শ্রীর রূপটা আমার চোখে লেগেছিল। আমি নেশার ঘোরে ছিলাম। কিন্তু মনের দিক থেকে আমি চলে এসেছিলাম, তোমারই কাছাকাছি। তুমিই

অনুরাধা তীক্ষ্ণ গলায় বললো, খবদার, আর এরকম কথা বলবেন না।

শান্তনু থতমত খেয়ে বললো, কেন?

আমি পছন্দ করি না। এ কথা বলার কি মানে হয়, তা বুঝতে পারছেন না?

—কি?

—এতে আপনার চরিত্র অত্যন্ত ছোট হয়ে যায়। আপনি একজনের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, তারপর কাছাকাছি আর যে মেয়েকে দেখলেন অমনি তাকেই প্রেম নিবেদন করে ফেললেন! ছিঃ!

—ব্যাপারটা তা নয়।

—তাছাড়া আবার কি?

—শুনতে ওরকম মনে হলেও, এটা আসলে আমার ভুল-ভাঙা। যদি জয়শ্রীর সঙ্গে আমার বিয়েও হয়ে যেত, তাহলেও একদিন না একদিন আমি তোমাকে এই কথাটা হয়তো বলতাম। মুখে না বললেও মনে মনে—

অনুরাধা হঠাৎ খুব রেগে গেছে। জ্বলন্ত চোখে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললো, বাঃ, কি চমৎকার কথা!

—কিন্তু এটাই সত্যি কথা।

—এরকম সত্যি কথা আর কোনদিন আমার সামনে বলার চেষ্টা করবেন না। বোম্বেতে এ কথা বলার অনেক মেয়ে পাবেন।

শান্তনু মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে বললো, আচ্ছা, বলবো না। তুমি এরকম রেগে গেলে? আমি কিন্তু তোমাকে কোনো আঘাত দিতে চাই নি। নিজের মনের কথাটাই বলে ফেললাম আর বলবো না কখনো। আমি চলে যাচ্ছি। আর দেখা হবে না।

অঞ্জন কিছুদিন হলো জামিনে ছাড়া পেয়েছে। রোগা হয়ে গেছে বেশ, তবে মুখে চোখে একটা কঠিন একরোখা ভাব। কারুর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলে না। মাঝে মাঝে দু'তিনদিনের জন্য কোথায় উধাও হয়ে যায়। অনুরাধা তার সামনাসামনি পড়ে গেলে অঞ্জন নিয়ম করে অবহেলার সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

রুমা বৌদির অসুখ খুব বেড়েছে। প্রণবেশের পিসীমা এখানে এসে আছেন। প্রণবেশ এখন আফিসে ছুটি নিয়েছেন, বাড়িতে সব সময়ই লোক-জনের আনাগোনা! তবু অনুরাধা একা আর কক্ষনো ঐ ফ্ল্যাটে যায় না, মাঝে মাঝে যায় মায়ের সঙ্গে। কেননা, ওরই মধ্যে রুমা বৌদির যখন খুবই অসুখ, কয়েক মুহূর্তের নিরালা পেয়ে প্রণবেশ অনুরাধার হাত চেপে ধরেছিলেন।

এতদিনের সংযমের বাঁধ ভেঙে, সেই সংকটময় সময়ে প্রণবেশের ঐরকম ব্যবহারে অনুরাধার আরও ঘৃণা হয়েছিল। প্রণবেশ কাতরভাবে বলেছিলেন, একটু দাঁড়াও, তোমাকে দেখি, আমার মাথা আর ঠিক থাকছে না! অনুরাধা ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিষ্ঠুরের মতন বলেছিল, কিন্তু প্রণবেশদা, আজকাল আপনাকে দেখলেই আমার গা বমি বমি করে! সেই কথা শুনে প্রণবেশের মুখে যেন মৃত্যুর ছায়া পড়েছিল।

একটা চাদর মুড়ি দিয়ে অঞ্জন বাড়ি থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। শান্তনু এসে তাকেই ঠিকানা জিজ্ঞেস করলো। বললো, চব্বিশ নম্বর বাড়িটা কোথায়?

অঞ্জনের সমস্ত শরীর সজাগ হয়ে উঠলো। একটা হাত চলে গেল পকেটে।

ভুরু কুঁকড়ে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথা থেকে আসছেন? ও বাড়িতে কাকে চাই?

—অনুরাধা রায়, কলেজে পড়ায় -

অঞ্জনের শরীর আবার সহজ হয়ে এলো। শান্তনুর আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উদাসীনভাবে বললো, ঐ যে ঐ বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান—

দোতলার সিঁড়িব কাছে যখন উঠেছে, তখন প্রণবেশ সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শান্তনু তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা, অনুরাধা রায় কোন তলায় থাকে?

প্রণবেশ শান্তনুর মুখের দিকে স্থিরভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর অস্ফুট গলায় বললেন, অনুরাধা।

পরক্ষণেই শান্তনুকে রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে ম্লানভাবে বললেন. আপনি আরও ওপরে উঠে যান।

এর আগে কেউ কোনোদিন এভাবে অনুরাধাকে ডাকতে আসে নি। কাজের কথা ভুলে গিয়ে প্রণবেশ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে শান্তনুর দিকে তাকিয়ে রইলেন—বুকের মধ্যে তাঁর ব্যথা মুচড়ে উঠলো, মুখখানা শুকনো পাতার মতন বিবর্ণ। শান্তনু ওপরে উঠে গেল।

দরজা খুলে দিয়ে অনুরাধা বললো আরে! আপনি কবে ফিরলেন?

—আজ সকালেই।

—আসুন, ভেতরে আসুন! বলেছিলেন যে অনেকদিনের মধ্যে ফিরবেন না! অথচ তিন মাসের মধ্যেই—

—একটা বিশেষ কারণে আসতে হলো।

বসবার ঘরে নানারকম হাবিজাবি জিনিসপত্র ছড়ানো। সাজানো নেই। দ্রুত হাতে একটু গোছগাছ করে অনুরাধা বললো, বসুন।

হঠাৎ শান্তনুকে নিজের ঘরের দরজায় দেখে অনুরাধা অবাক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মুখে সে-ভাব দেখালো না। শান্তনুও যে তিন মাস কলকাতায় ছিল না, সে রকম কোনো ভাব নেই তার। এমনভাবে অনুরাধার দিকে তাকিয়ে আছে যেন কালই দেখা হয়েছে।

শান্তনু বললো, অনেকদিন আগে তুমি একবার তোমার বাড়িতে আসতে বলেছিলে—তারপর তো আসা হয়নি। ঠিকানাটা মনে ছিল, আজ চলে এলাম।

—কলকাতায় এলেন কি অফিসের কাজে?

—না, অন্য একটা বিশেষ দরকারে। অনুরাধা, তুমি আমার সঙ্গে একটু বেরুবে ?

—এখন ? এই রাত্তিরে ? আটটা বেজে গেছে—

—এখন বেরুনো যায় না ?

—যায় হয়তো. কিন্তু মুশকিল হচ্ছে. বাবা-মা কেউ বাড়ি নেই যে। কেন, আপনার কোনো বিপদ-টিপদ হয়েছে নাকি ?

—আমি শুধু বিপদ হলেই তোমার কাছে আসি. তাই না ?

—কিন্তু আপনার মুখ চোখ এরকম দেখাচ্ছে কেন ?

- কই, কি রকম দেখাচ্ছে আবার !

- হ্যাঁ, কি রকম অন্যরকম দেখাচ্ছে। কিছু একটা হয়েছে—অসুখ-টসুখ করেছিল নাকি ?

—অনুরাধা, শেষ যে-দিন দেখা হয়. সেদিন তুমি আমার ওপর খুব রেগে গিয়েছিলে।

— আজে-বাজে কথা বললেই রাগ করবো। কি হয়েছে সত্যি করে বলুন !

—কিছু না। টানা দুদিন ট্রেন জার্নি করে এসেছি, তাই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তোমার কলেজে ফোন করেছিলাম, তোমাকে পাইনি।

—বসুন, চা করে নিয়ে আসছি।

- না, আমি চা খাবো না, এক গ্লাস জল দাও।

অনুরাধার হাত থেকে জলের গেলাস নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে বললো, আর এক গেলাস দাও।

এই সামান্য ব্যাপারটাতেই অনুরাধার মাথার মধ্যে ঝন্‌ন্‌ করে একটা শব্দ হলো। মনে পড়লো আর একটা ঘটনা। আর একজন এই রকম পরপর জল চেয়েছিল ! একটু কঠিন হয়ে গেল অনুরাধার মুখ।

শান্তনু গেলাস রেখে দিয়ে বললো, তোমার মনে আছে, একদিন সকালবেলা তুমি আর জয়শ্রী এসেছিলে আমার ওখানে ? তার দুদিন আগে থেকে আমার জ্বর হয়েছিল। সেদিন জয়শ্রী অনেকক্ষণ ছিল, জয়শ্রী কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু তুমি এসেই বলেছিলে, এ কি, আপনার জ্বর-টর হয়েছে নাকি ? সেদিনও আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি। এই রকম কিছু স্নেহ-মমতার নামই তো ভালোবাসা।

অনুরাধা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, এখান থেকে অনেকখানি রাস্তা দেখা যায়। যেন সে রাস্তাই দেখছিল, শান্তনুর কথা শুনতেই পায়নি এই ভাবে বললো, জয়শ্রী কালকেই এসেছিল আমার এখানে। আপনি—যদি আজকের বদলে কাল আসতেন, ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত।

শান্তনু স্থির চোখে চেয়ে আছে অনুরাধার দিকে। সেও যেন এই কথাটা শুনতে পায়নি। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো চোখে চোখে। অনুরাধার অস্বস্তি হচ্ছে, কিন্তু চোখ সরিয়ে নিতে পারছে না। এই তিনমাসে শান্তনু একটু রোগা হয়েছে, মুখের চোখের চেহারা শুকনো, তাকে অন্য মানুষ মনে হয়।

হঠাৎ গম্ভীর গলায় শান্তনু বললো, অনুরাধা, তোমাকে একটা কথা বলতেই আমি কলকাতায় চলে এসেছি। চিঠি লিখলে তুমি উত্তর দেবে না—

সেই গলার আওয়াজে একটু কেঁপে উঠলো অনুরাধা। ফ্যাকাসে ভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি?

উঠে দাঁড়িয়ে দু-এক পা এগিয়ে এলো শান্তনু, চোখ থেকে একবারও চোখ সরায়নি, অকম্পিতভাবে বললো, আমি এতদিন নিজেকে চিনতে পারিনি। আমি তোমাকেই শুধু ভালোবাসি।

দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করে অনুরাধা বললো, আবার ঐ সব পাগলামি শুরু করলেন। বলেছি না, আপনাকে এসব মানায় না।

—পাগলামি নয়। এই তিনমাস তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি, তোমাকে চিঠি লিখিনি। কিন্তু এই তিনমাস জয়শ্রীকে আমার প্রায় মনেই পড়েনি, আমি শুধু তোমাকেই

—প্লিজ, ওকথা বলবেন না।

—কেন?

হঠাৎ অনুরাধার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো. সারা শরীর কাঁপতে লাগলো। অসহায়ের মতন অনুনয় করে বললো, না, প্লিজ বলবেন না, আমি শুনতে চাই না।

—আমাকে বলতেই হবে।

—আমি প্রত্যাখ্যান করবো। আমি কান ঢেকে থাকবো। আমি ভালোবাসায় বিশ্বাস করি না। আমি মানি না ওসব কিছু, আমি

—তবুও আমি বলবো, আমি তোমায় ভালোবাসি। ঘাক হয়েছে ঠিকই,

—না, আমি শুনতে চাই না! শুনতে চাই না ও কথা!

শান্তনু আর একটু এগিয়ে সন্তর্পণে অনুরাধার বাহু ছুঁয়ে ব্যাকুলভাবে বলতে লাগলো, অনুরাধা, তুমি কতবার আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে? কতবার? কতবার? বলো?

অনুরাধা দ্রুত জানলার দিকে ফিরে দু'হাতে মুখ ঢাকলো। সামলাতে পারলো না, প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়লো। এত কান্নাও তাঁর বুকে জমা ছিল? এ যেন হঠাৎ পাহাড় ফাটিয়ে বেরিয়ে এলো জলপ্রপাত।